আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা

আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা

শেফালী দাস

আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা
শেফালী দাস
প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২৪
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য : ৩০০ (তিনশত) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৮৭-৪-৩
ISBN: 978-984-97987-4-3

Adhare Jalise Dhrubotara By Sefali Das, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900.; Date of Publication: November -2024; Copy Right:Writer; Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer; Price: 300/- (Three Hundred Taka Only);

ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার : ০১৬১১-৯১৩২১৪

উৎসর্গ

যার অবহেলা ও অবজ্ঞায় মনের দুঃখে কলম ধরেছি,
আমার সেই ছোট ভাই গোপাল চন্দ্র সাহাকে
আমার বইখানি স্নেহের দান হিসেবে উৎসর্গ করলাম।

১ম অধ্যায়

বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। প্রকৃতির নিয়মানুসারে বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আর এদিকে ঘরের মধ্যে ১৭/১৮ বছরের একটি মেয়ে জেগে ভয়ে ও দুঃখে কাতর হচ্ছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সুদীপ্তা শুনতে পেল কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। কান খাড়া করে স্পষ্ট করে শুনতে চেষ্টা করল এত রাতে কে কড়া নাড়ছে। মেয়েটি ভয়ে বলে উঠল, কে? বাইরে থেকে উত্তর ভেসে আসল, 'আমি মা, দরজাটা খোল'। সুদীপ্তা দরজা খুলে দিয়ে বাবাকে ধমকের সুরে বলল, 'এটা কি ঠিক কাজ করেছ? ভাই এতক্ষণ কাঁদছিল, তাকে অনেক বুঝিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।' মেয়েটির বাবা সমরেশের কানে এসব ঢুকলো কিনা বোঝা গেলা না। সে ঘরে ঢুকেই ধপাস করে সোফাতে বসে পড়ল। সুদীপ্তা ভয় পেয়ে বলল, 'বাবা ব্যথা পেলে?' বাবা বলল, 'না রে মা, যে ব্যথা বিষের মত অন্তরে বিঁধে রয়েছে, তারপর কোন ব্যথাই কোন দুঃখ দিতে পারে না।' সুদীপ্তা বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, 'বাবা আমার একদম ভাল লাগছে না, তুমি চুপ কর, সব ভুলে যাও।' বাবা গভীর আবেগে বলল, 'তাই কি হয়, ভোলা কি সম্ভব এতদিনের সম্পর্ক। এত ভালবাসা, এত স্মৃতি এগুলো কি মুছে ফেলা যায়?'

– তা যায় না বাবা, তোমার মেয়ে তো বড় হয়েছে সব বুঝে। তাই বলি তুমি শান্ত হও। বাবা আমি তোমার কোলে একটু শুয়ে থাকি।

বাবা আবেগাপ্লুত হয়ে মেয়েকে আরও কাছে টেনে বলল, 'সেজন্য কি বাপের অনুমতি নিতে হবে', বলে মেয়েকে বুকের কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। আর বলতে লাগল 'তোরা আছিস বলে আমি বেঁচে আছি।'

সুদীপ্তা বাবার মুখ চেপে ধরে বলল, 'এমন কথা আর কখনো বলবে না। বাবা বড় ঠাম্মিকে নিয়ে আসো বড় ঠাম্মি এলে তোমার দুঃখ কিছুটা কমবে।'

বড় মায়ের কথা বলাতে সমরেশ কেঁদে ফেলে বলল, 'বড় মায়ের দুঃখ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। বড় মা যেভাবে আমাকে মানুষ করেছে, শুনলে তোরা অবাক হবি, তার ছেলেকে কোনদিনও এতটুকু কষ্ট পেতে দেয়নি। বড় মাও নিজের ছেলেই মনে করত। তার মেয়ে বাবাকে বলল, 'তুমি চুপ কর আর কাঁদবে না সব আমি ও বাড়ির বড় ঠাম্মির কাছে শুনেছি। বড় ঠাম্মিরা যে কত ভাল তাও আমার ঠাম্মির কাছে শুনেছি।' সুদীপ্তা বাবাকে বাথরুমে পাঠিয়ে বাবার খাবার বেড়ে টেবিলে দিল। তারপর বাবাকে খাবার টেবিলে বসিয়ে মায়ের মত ছেলের পাশে বসে খাওয়াতে লাগল। উদ্বিগ্ন যার মন সে কি খেতে পারে। কোন রকমে দু তিন গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে খাবার ফেলে রেখে বেসিনে

হাত মুখ ধুতে গেল। সুদীপ্তা বলল, 'এ কি করলে বাবা? ভাল হবে না কিন্তু। তুমি যদি না খাও তাহলে আমরাও খাব না, তখন দেখব তোমার কেমন লাগে। বাবা তুমি যেমনি মাকে ভালবেসেছ আমরাও তো তেমনি ভালবেসেছি। তোমার যতখানি দুঃখ আমাদেরও তো এতখানিই দুঃখ। কাজেই আমরা সমান ভাগিদার। এসো শুবে, আজ আমি ও ভাই তোমার কাছে শুবো।'

২য় অধ্যায়

যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পেশায় উকিল। বাড়ি সুরুজ কিন্তু তিনি টাঙ্গাইল শহরের আদালত পাড়ায় বাড়ি করে থাকেন, আর মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে যান। তখনকার দিনে মানুষ সাইকেল কিংবা পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করত। যতীন্দ্র হেঁটেই যাতায়াত করত। কোনও এক রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটিতে টাঙ্গাইলের বাড়ি থেকে নিজের গ্রামের বাড়ি হেঁটেই রওনা হলেন। সুরুজে আত্মীয়দের সঙ্গে কুশলাদি জেনে এবং ওদের ওখানে দুপুরে খেয়ে দেখা সাক্ষাৎ করে-সন্ধ্যার আগ দিয়ে টাঙ্গাইলের দিকে রওনা হল। ঘারিন্দা বাজারে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, চেনা মানুষ দেখা যায় কিনা, তা না দেখে দেখতে পেল লম্বা ঘোমটা টেনে বটগাছটার নিচে বসে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার যাওয়ার কোথাও জায়গা নেই। আবার সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, সে এখন কি করবে? এমন সময় যতীন বাবু ওর সামনে এসে পড়ল। ভদ্রলোকটিকে দেখে মহিলাটি লজ্জায় একটু সরে কুচকাচ হয়ে বসল। যতীন বাবু ওর আরও নিকটে যেয়ে বলল, 'তুমি কে? এখানে একলা বসে আছ? তোমার সঙ্গে কেউ আছে কি। তাহলে সে কে?' মহিলা উত্তর না দিয়ে কাঁদতে লাগলো, তখন যতীন বাবু বলল, 'তোমার পরিচয় কি বল আমি তোমাকে সেখানে দিয়ে আসবো।' এ কথা শুনে মহিলাটি আরও জোরে জোরে কেঁদে উঠল। যতীনবাবু আরও একটু কাছে যেয়ে বলল, 'তুমি কি আমাকে বিপদে ফেলতে চাও। আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আর তুমি কাঁদছো। লোকে দেখলে কি ভাববে বলতো? আচ্ছা বল, তোমার বাড়ি কোথায়?'

– আমার বাড়ি নেই, এ সমাজে কি মেয়েদের বাড়ি থাকে?

– আচ্ছা, তাহলে বল তোমার স্বামীর বাড়ি কোথায়?

– আমার স্বামীর বাড়ি বার্তার ভট্টাচার্য বাড়ি।

– কি হয়েছে বলতো, চল ঐ যে ওখানে একটা গোলাঘর আছে সামনে একটা বেঞ্চ পাতা আছে, চল ওখানে বসি।

ঐ গোলাঘরে কুপি জ্বালিয়ে দোকান করছে এক বৃদ্ধ। সে যতীন বাবুকে আলো আঁধারিতেও দেখে চিনতে পেরেছে। দোকানদার বলল, 'উকিল বাবু বসুন। মহিলা তো লজ্জায় কিছু বলতে পারছে না। তাই আমি বলি। প্রথমে মহিলাটি আমার দোকানের কাছে এসে বসেছিল। আমি সব কথা খুচিয়ে খুচিয়ে শুনেছি। ওর বাচ্চাটা পেটে থাকতেই ওর স্বামী কলেরায় মারা যায়। তখনই ওকে তাড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীদের অনুরোধে এত দিন রেখেছিল। দেখুন এতটুকুন দুগ্ধ পোষ্য ছেলেটাকে কেউ তাড়ায়? তাছাড়া তোদেরই বংশ, এতটুকুও মায়া মমতা নেই তোদের। তোরা এত নিষ্ঠুর তাই আমি বলেছি বস, দুনিয়াতে যেমন খারাপ লোক আছে, তেমন ভাল লোকও আছে। বাবু চেষ্টা করে দেখবেন কি, কোথাও কাজে লাগানো যায় কিনা?' বাবু বলল, 'হ্যাঁ তাতো যায়ই, এই যে তুমি আমার সঙ্গে যাবে, আমার গিন্নি দেখলে খুবই খুশি হবে। মনস্থির করে বলো।' আর দোকানদারকে বলল, 'ওর শরীকরা তো পরে আবার এ নিয়ে ঝামেলা করবে না? বাপু আমি ভদ্র লোক মান সম্মানের প্রশ্ন আছে।' দোকানদার বলল, 'ওদের এতটুকু শক্তি নাই যে উকিল বাবুর সঙ্গে লড়ে। ওদের খাবারই জোটে না, তাইতো তাড়িয়ে দিয়েছে। আর কোন কারণ নেই। পূজা করে যা পায় তাই দিয়ে কয়দিন চলে। মহিলা আর তার বাচ্চার খাবার সংস্থান ওরা করতে পারবে না।'

উকিল বাবু বিনীতভাবে মহিলাকে বলল, তুমি যদি মনে কর তবে তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার। দোকানদারও মহিলাকে অনুরোধ করল। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন ঘারিন্দা বাজারে ভিড় করে দাঁড়ালো। যারা ভিড় করেছে তারা নানা কাজে বাজারে এসেছে, কেউ হয়তো এই পথ দিয়ে সুরুজ, ভুক্তা, বার্তা ইত্যাদি গ্রামে তাদের বাড়ি ফিরছিল। সবাই একই কথা বলল, 'মা তুমি বাবুর সঙ্গে যাও। তোমার ভাল হবে।'

সবার এত কথা শুনে, আর অন্য কোন উপায় না থাকাতে, কোথায় যাবে কি খাবে কোন কিছুই তার হাতে না থাকাতে মহিলা আস্তে আস্তে কান্না থামিয়ে উকিল বাবুর সাথে যেতে রাজী হলো। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, 'মা তুমি ঠিক কাজ করেছ, তোমারও ভাল হবে, তোমার সন্তানও মানুষ হবে। তোমার ভাগ্য খুব ভাল। তুমি এমন মানুষের হাতে পড়েছ। তোমাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। উকিল বাবুর মত লোকই হয় না, দেবতাতুল্য মানুষ। বাবু নিয়ে যান, ভগবান ওর মঙ্গল করুক।'

আরতি ভট্টাচার্যকে তার ছেলেসহ উকিলবাবু টাঙ্গাইলের বাড়িতে নিয়ে এসে গেটের সামনে থেকেই ডাকতে লাগল, গিন্নি ও গিন্নি দেখে যাও কাকে এনেছি। গিন্নি এ কথা শুনে মনে মনে ভেবে নিয়েছে হয়তো তার কোন নিকট আত্মীয় কেউ এসেছে। তাই দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল। কর্তা গিন্নিকে উদ্দেশ্য

করে বলল, 'দেখ কাকে এনেছি।' পরিচিত কাউকে দেখতে না পেয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'স্পষ্ট করে বলবে তো? কাকে এনেছ?'

– দেখতে পাচ্ছ না, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে!

– ও এই মহিলা। তা কেগো তুমি, কোথা থেকে এসেছ?

মহিলা কোন উত্তর না দেওয়াতে উকিল বাবু নিজেই বলল, 'তুমি না এতদিন আমার কানের মাথা খাচ্ছিলে, একটা কাজের লোক এনে দাও, ছোট বাচ্চা নিয়ে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। এখন এনে দিলাম, দেখে শুনে নাও।' উকিল গিন্নি মহিলার কাছে গিয়ে ঘোমটা খুলে চিৎকার দিয়ে উঠল 'ওমা এতো আগুনের স্ফুলিঙ্গ, একে কে দেখে শুনে রাখবে? নাগো না না আমি এত অল্প বয়স্ক বিধবা সুন্দরী মেয়ে রাখতে পারবো না। তুমি ওকে যেখান থেকে এনেছ সেখানে রেখে এসো।' যতীনবাবু বলল, 'দেখেই আঁতকে উঠলে। ভিতরতো কিছুই জানো না।' তারপর আস্তে আস্তে আরতির সকল বৃত্তান্ত বাড়ির সবার কাছে বলাতে সবারই মন আরতির প্রতি সহানুভূতিশীল হল। সবাই বলল, 'রাখ, একটা লোককে না দেখে তো আর কোন মন্তব্য করা যায় না।' উকিল গিন্নি বলল, 'আমার ছোট ছেলে সংসারে কাজ করতে অসুবিধা হয়, আর এতো দেখি ওরও ছোট ছেলে কি করে আয়াস হবে।' উকিল বাবু বলল, 'তোমার ছোট বাচ্চার জন্য কি তুমি সংসারের কাজ ছেড়ে দিয়েছ? তাতো নয়।' আরতিও ঠিকই সংসারের কাজ করবে এবং বাচ্চার দেখা শুনাও করবে।

উকিল গিন্নি চটাং চটাং কথা বললে কি হবে অন্যদিকে তার মনটা খুব সরল নরম ও উদার। উকিল গিন্নির নাম সরলা। সে আরতিকে দিদি বলে ডাকে, আর আরতিও সরলাকে দিদি বলে ডাকে। ইতোমধ্যে দু'জনের মধ্যে খুব মিল হয়েছে। আরতি দিদির অনুমতি ছাড়া একটা কাজও করবে না। দিদির কাছে শুনে তার পরামর্শ মত কীভাবে কি করতে হবে সেভাবেই সে কাজ করে। এতে সরলা ভয়ানক খুশি।

উকিল বাবু আরতিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ছেলের নাম কি রেখেছ? ওর তো অন্নপ্রাশন দিতে হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে সেই নিয়মেই সব করতে হবে।'

আরতি বলল, 'না দাদা ওর নাম রাখা হয়নি, ওরতো কেউ নেই। বাবা নেই, দাদা নেই। আপনারাই ওর সব। নাম রাখা, অন্নপ্রাশন দেওয়া সবই আপনাদের হাতে।'

উকিলবাবু বলল, 'তাহলে আমার ছেলে ও তোমার ছেলেতো সমসাময়িক-তাই ওদের নাম মিলিয়ে রাখি, আমার ছেলের নাম অমরেশ চক্রবর্তী আর তোমার ছেলের নাম সমরেশ ভট্টাচার্য। দু'জনের অন্নপ্রাশন এক সঙ্গেই দিবো।

আরতি রাজী আছ তো? যাই আবার আরেক মাকে রাজী করাই। সরলা- সরলা- বলে ডাকতে ডাকতে উকিল বাবু রান্না ঘরের দিকে গেল।

একই বিছানায় দুটি ছেলে ঘুমিয়ে থাকে। বাইরে থেকে কেউ এসে জিজ্ঞেস করে যমজ ছেলে নাকি? ওরাও হেসে বলে, 'হ্যাঁ যমজ।' উকিল বাবু মা-ছেলেকে যথেষ্ট আদর যত্ন করে থাকে। অপরিচিত কেউ আসলে ভাববে আরতি ওদেরই আপন কেউ। কারও এতটুকু বোঝার উপায় নেই আরতি কাজের মাসী। আরতিও চক্রবর্তী বাড়ির সঙ্গে এমন মিশে আছে যে সে কখনও ওদেরকে পর ভাবে না। আর পর ভাববে কি করে উকিল বাবু আরতির দুঃসময়ে ওকে ও ওর ছেলেকে মাথায় তুলে এনে নিজ সন্তানের মত প্রতিপালন করছে। শুধু খাওয়াই নয়, আদরে যত্নে কোথাও কোন ত্রুটি রাখে নাই। সারাদিনও যদি আরতিকে দিয়ে কাজ করানো হয় তাতে আরতি এতটুকুও অসন্তুষ্ট নয়।

যে উকিল বাবু তার সবটুকু স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে ওদের বাড়িতে রেখেছে সচরাচর এমনটি দেখা যায় না। উকিল-গিন্নির ব্যবহার যেমন মধুর উকিল বাবুর ব্যবহার তেমনই। তাই তো আরতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আরতি জীবনে এত ভাল লোক দেখেই নি। রাস্তা থেকে অনাথ মা-ছেলেকে কুড়িয়ে এনে এত আদর যত্নে মানুষ করে; এটা আরতি ভাবতেই পারেনি। স্বামী বেঁচে থাকতেই খুব একটা রোজগার করত না বলে অনেক ঝাটা লাথি খেতে হতো। তারপর স্বামী মারা যাওয়াতে তো শ্বশুরবাড়িতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। এত কিছু সহ্য করেও মাটি আকড়ে স্বামীর ভিটেতে পড়ে ছিল। সারাদিন রাতে কোনদিন এক বেলা দু' মুঠো ভাত কপালে জুটত কোন দিন তাও জুটত না। দুধের শিশু দুধ পেত না, কান্নাকাটি করত। তাতে জা বলতো অলক্ষ্মীর মত সারাদিন কান্নাকাটি আর সহ্য হয় না। ওকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আয়। শিয়াল-কুকুরে টেনে হিঁচড়ে খেয়ে ফেলুক। তখন আরতির বুক ধুকধুক করে কেঁপে উঠত। শত আরাধনা করে লোকে সন্তান পায় না আর না চাইতেই ভগবান আমাকে এমন ধন দিয়েছে। এ আমার মস্তবড় পাওনা। আমার নাড়ি ছেঁড়া ধনকে যেমন করে পারি বাঁচিয়ে তুলবই। আমার সন্তান বড় হবে। মানুষ হবে, লোকে তাকে জানবে চিনবে দশজনের একজন হয়ে আবার নিজের গাঁয়ে ফিরে আসবে। সবাই দেখে বলবে, ঐ দেখ হতভাগিনী আরতির ছেলে। আরতি ভাবে, তখন আমার বুকটা গর্বে ফুলে উঠবে। আর কান্না নয়, এবার হাসবো। ভগবান তুমি শুধু মুখ তুলে তাকাও।

সমর ও অমর দুজনেই ২য় শ্রেণিতে পড়ে। সমর উকিলবাবুকে জ্যাঠাবাবু ও তার স্ত্রীকে বড় মা বলে ডাকে। ছোট্ট ছোট্ট হাতে জ্যাঠা বাবু ও বড় মাকে গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে আদর জানায়, তাতে বড় মা ও জ্যাঠাবাবু দুজনেই মহাখুশি। তাদের দুজনের জামা কাপড় সবকিছু একই রকমের তৈরি করে দেয়,

তাছাড়া সমর ও অমর কখনও ঝগড়া করে না, ওদের দুজনের খুব মিল। পিঠাপিঠি আপন ভাইবোনের মধ্যেও মারামারি ও ঝগড়া ঝাটি হয়ে থাকে। কিন্তু ওদের মধ্যে এ সমস্তের বালাই নেই।

একজন খুব রেগে গেলে আর একজন তা মেনে নিয়ে নিজে চুপ করে থাকে যাতে ঝগড়া থেমে যায়। তাছাড়া স্কুলে সমরকে কেউ কিছু বললে অমর সমরের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করবে আবার অমরকে কেউ কিছু বললে সমর অমরের পক্ষ নিবে।

একদিন সুমন নামের এক ছেলে সমরকে কিল ঘুষি মারছে দেখে অমর দৌড়ে এসে সুমনকে মারতে লাগল। তখন সমর বলতে লাগল, 'আমি আজই জ্যাঠাকে বলে এত খারাপ ছেলেকে স্কুল থেকে বের করাবার ব্যবস্থা করাব। এ স্কুলে কোন রকম খারাপ ছেলে পড়তে পারবে না। দাঁড়াও তোমার ব্যবস্থা করাচ্ছি।' সুমন ফোঁস করে উঠে বলল, 'যা যা কাজের বেটীর ছেলের কত আস্ফালন, জ্যাঠাবাবু বাড়িতে রেখেছে তাই এত কথা।' তখনই অমর দৌড়ে এসে সুমনের কান ধরে বলল, 'কি বললি কাজের বেটী, আর একবার বলতো দেখি, দুটো কানই ছিড়ে রেখে দিব। ওর পা ধরে মাফ চেয়ে বল, কাকিমাকে কোন দিনও আর এমন কথা বলবি না।'

একথা বলেই অমর সুমনকে এত জোরে লাথি মারল যে সুমন গড়াতে গড়াতে অনেক দূর চলে গেল। ওখান থেকে উঠে এসে খোড়াতে খোড়াতে অমরের কাছে মাফ চাইল। অমর আর এক লাথি মেরে বলল, 'আমার কাছে নয় সমরের কাছে ক্ষমা চা।' সমর কাছে এসে বলল, 'থাক থাক অমর মাফ চাইতে হবে না। বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে এ রকম হয়েই থাকে।' 'সুমন যদি ক্ষমা না চায় তবে এটা অনেক দূর গিয়ে গড়াবে। বড়রা যখন জানবে কাকিমাকে অসম্মানজনক কথা বলেছে, তখন এর পরিণতি কি হবে বুঝতে পেরেছিস?' সবাই যার যার মত বাড়ি চলে গেল। স্কুলটার নাম 'সুরেন্দ্র নাথ উচ্চ বিদ্যালয়'। এটির প্রতিষ্ঠাতা যতীন্দ্র নাথের বাবা।

ওরা ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। বুদ্ধিও বেড়েছে। অমর বলল, 'বাড়ি গিয়ে বড়দের কিছু বলবি না, ঝামেলা বাড়াবি না। এ সমস্ত আমি একদম পছন্দ করি না।'

দুই ভাইয়ের অন্যমনস্ক ভাব দেখেই আরতির যেন কেমন সন্দেহ হলো। ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আয়তো বাবা এদিকে, মুখচোখ এমন দেখাচ্ছে-কেন?' কিছু না বলে অমর ঘরে চলে গেল।

৩য় অধ্যায়

আরতি উকিল বাবুর বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে ভীষণ খুশি। তার ছেলে এ বছরই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে। তাতে আরও খুশি। বার্তায় ভট্টাচার্যদের বাড়ি সমরেশের বাবার বাড়িতে থাকলে লেখাপড়া হতো না। অন্নের সংস্থান করতেই তাদের হিমশিম খেতে হয়। নামাবলী গায়ে চড়িয়ে ছুটতে হতো যজমানদের বাড়ি, কবে কি পূজা হবে। কোনদিন কপালে টাকা জুটতো কোনদিন খালি হাতে ফিরে আসতে হতো। এটার নাম কি জীবন। এখানে এসে ছেলের লেখাপড়া ব্যবহার সবকিছুরই উন্নতি হচ্ছে দেখে, নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করে আরতি। আর ভগবানের কাছে কামনা করে তাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখতে। ছেলেকে যেখানে ভাত দিতে পারতো না সেখানে লেখাপড়া করানো তো আরও দুরূহ। শুধু কি স্কুলে পড়া? উকিল বাবু অমরেশ আর সমরেশকে কখনও আলাদা দেখত না। নিজের পুত্র অমরকে যা যা করে সমরকেও সেভাবে মানুষ করছে। অমরেশের চেয়ে সমরেশ লেখাপড়ায় ভাল। সমরেশ ক্লাশে প্রথম হয় আর অমরেশ ৪র্থ স্থান পায়। এভাবেই চলছে দু'ভাইর লেখাপড়া। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দুজনেই ১ম বিভাগে দুটি করে লেটার নিয়ে পাশ করেছে। এতে সবাই সন্তুষ্ট।

উকিল বাবু ঠিক করলেন দুজনকেই ঢাকা কলেজে ভর্তি করে দিবে। উনার যা ইচ্ছা তাই হলো। ঢাকা কলেজের এক প্রফেসর তার বন্ধু, দুজনে এক সঙ্গে কলেজে লেখাপড়া করেছে। উকিল বাবু একদিন সময় করে ঢাকা গিয়ে ওদের ভর্তি সম্বন্ধে নানা তথ্য জেনে আসলো এবং ফরম এনে ফিল আপ করে ছেলেদের দিয়ে পাঠাল। এ পর্যন্ত ওরা ওদের জেলার বাইরে যায়নি। তাই যতীন বাবু ভাবল এবার ওরা ঢাকা গিয়ে বাহিরটা একটু ঘুরে দেখে আসুক। ওরা দুজনে ঢাকা এসে প্রথমে অকূল সমুদ্রে পড়ে গেল। ওরা সব গলি ও সব পথকে একই পথ ভাবতে লাগল। দু বন্ধু বলাবলি করতে লাগল একি গোলক ধাঁধায় পড়লাম। তারপরে দু বন্ধু মিলে রাস্তার ধারে দোকানের সাইনবোর্ড দেখে দেখে রোড ও নাম্বার দেখে রোড চিনতে লাগল এবং একটা সি.এন.জি ডেকে তাতে উঠে বসে গন্তব্য স্থানের নাম বলাতেই সিন.এন.জি ড্রাইভার ওদের ঠিকমত নিয়ে গেল। তখন দুবন্ধু হরষে উল্লসিত হয়ে করমর্দন করল, ঢাকা এসে হারিয়ে যাবো এটা কখনো হয়। আমরা দু বন্ধু যেখানে বিপদ-আপদ নাই সেখানে, চল বন্ধু আমরা দুনিয়া ঘুরে আসি।

যথারীতি দু'বন্ধু বাড়ি এসে পৌঁছল, উকিল বাবু তো মহাখুশি। এই প্রথম সে ছেলেদের একলা বাইবে পাঠিয়েছে। আর ছেলেরাও ঠিকমত বাপের হুকুম পালন করে কার্যসিদ্ধি করে এসেছে, উকিল বাবু ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, তার

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা এবং সে কি বলল? ওরা বলল, 'আমাদের যথেষ্ঠ আদর করেছে, উনার বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছে। আমরা বললাম, 'কাকা আপনার প্রচেষ্টা ও ভগবানের আশীর্বাদে যদি এই কলেজে ভর্তি হতে পারি তখনতো আর বলতেই হবে না। প্রতিদিনই আপনাকে বিরক্ত করব। আপনি আশীর্বাদ করবেন আমরা যেন ভর্তি হতে পারি।'

তিনি বললেন, তোমাদের এত ভাল রেজাল্ট, অবশ্যই তোমরা ভর্তি হতে পারবে। তোমার বাবাকে আমার আদাব জানাবে। তোমরা যোগাযোগ রেখো। অমরেশ বলল, 'বাবা তোমার বন্ধুটি এত ভাল যে, আমাদের মনেই হলো না যে উনার সঙ্গে এই প্রথম আমাদের দেখা, মনে হচ্ছিল সেই কবে থেকে আমাদের পরিচয়।' উনি নিজেই আমাদের আপন করে নিল। উকিল বাবু ছেলেদের বলল, 'তোমরা হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নাও। আমি পরে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করব।' ওরা পিছন ফিরে দেখে দুই মা এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছে। ওরা বলল, 'কিছু বলবে?' বড় মা বলল, 'না তোরা হাত মুখ ধুয়ে বোস আমরা তোদের খাবার আনছি।' ছেলেরা ইন্দারার দিকে গেল হাত মুখ ধুতে। হাত মুখ ধুয়ে দু'জনে কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে ঘরের দিকে গেল।

ভর্তি পরীক্ষার ফল ভাল হয়েছে, দুজনকেই ভর্তি ফরম পূরণ করে ভর্তি হওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দুইবন্ধু ভর্তি তারিখ অনুসারে রওনা দেবার প্রস্তুতি নিল। তখন যতীনবাবু বলল, 'আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে, আমার মনটা বেশি ভাল লাগছে না।' ওরাও বলল, 'তবে চল, আমাদেরও ভাল লাগবে।' বাবাকে সঙ্গে নিয়ে দুই বন্ধু ঢাকায় উপস্থিত হল। সব ঠিক আছে ভর্তি হয়ে গেল। কিন্তু এখানে এসে ভীষণ গোলমাল হয়ে গেল। বাবাকে এসে বলল, 'বাবা এটা তো হতে পারে না সমরকে দিয়েছে পূর্বদিকের হলে আর আমাকে উত্তর দিকের হলে। বাবা 'এটা কেমন হলো? তুমি তোমার বন্ধুর কাছে যাও।' বাবা হেসে বলল, এটা যে খুবই খারাপ হলো সেটা আমি বুঝি। হরিহর আত্মারা যে আলাদা থাকতে পারে না। মানিকজোড় কি করে তাদের জোড় ভেঙ্গে থাকবে?' বাবার কথা শুনে অমর রাগ করে বলল, 'তুমি বাবা ঠাট্টা করছ? তুমি তাড়াতাড়ি তোমার বন্ধুর কাছে যাও।' বাবা আর কি করবে বাধ্য হয়ে বন্ধুর কাছে সুপারিশ করার জন্য গেল। বন্ধু তো ওদের মানিকজোড়ের কথা শুনে হেসে অস্থির হলো। তবুও সে বলল, 'দেখি কি করা যায়।' খানিক পর প্রফেসর বন্ধু ফিরে এসে বলল, 'এখন ভর্তি হোক পরে দেখা যাবে। অমর রেগে অস্থির।' বলল, পরের জন্য আমি অপেক্ষা করব না । এখনই যদি সিট চেঞ্জ না করে দেয় তবে আমি এ কলেজে পড়বো না এবং সমরকেও পড়তে দেব না। আমরা দু বন্ধুতে একই কলেজে পড়বো এবং একই হলেই থাকবো। ছেলের প্রতিজ্ঞাগুণে প্রফেসর সাহেব খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। সে চলে গেল তদবির করতে।

সারাদিন এ বিষয়ে নানা বাগবিতণ্ডার পর সিটের সুরাহা হলো এবং ওরা হাসি মুখে ভর্তি হয়ে ফিরে এলো।

ছেলেদের আসতে দেরী হচ্ছে বলে মায়েরা গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। উকিলবাবু বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'জানো তোমার ছেলে কলেজে আজ যা কাণ্ড করেছে, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে।' উকিল গিন্নি সে কথায় কান না দিয়ে বলল, এত দেরী করে এলে বলে আমরা সবাই চিন্তাগ্রস্ত। হ্যাঁ গো, কোন অসুবিধা হয়নি তো? উকিল বাবু আরও বেশি করে হেসে দিয়ে বলল, 'অসুবিধা হয়নি আবার। তোমার ছেলে যে সমস্ত কাণ্ড কলেজের ভিতর ঘটাল তা শুধু নয়'... অমর বাবাকে থামিয়ে বলে উঠল। বাবা ভাল হচ্ছে না কিন্তু। তুমি আবার ঠাট্টা করছ! আমি যদি জেদ ধরে না থাকতাম তাহলে কি কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা শুনতো? আমাদের দুজনের সিট একই হলে করে দিত। বাবা আবার হেসে বলল, 'বেশ বেশ আমার বীরপুত্র প্রমাণ করল যে ওরা হরিহর আত্মা।' অমর প্রায় কাঁদ কাঁদ সুরে বলল, বাবা আবার- তুমি থামো থামো। আর কিছু বলবো না বলেই উকিলবাবু বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। আরতি ও সরলা কিছুই বুঝতে না পেরে দুজনে চোখ ইশারা দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। বাড়ির ভিতরে যেয়ে আরতি সমরকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে বাবা? তোর জ্যাঠা হেসেই মরে যাচ্ছে।' সমর বলল, 'কিছু হয়নি মা, সামান্য ব্যাপার। আমাদের দু'ভাইয়ের সিট দু'হলে পড়েছে দেখে অমর ভর্তি হবে না, কলেজেও যাবে না বলে জিদ ধরে দুজনের সিট এক হলে করে নিয়েছে। জ্যাঠা তাতেই হেসে অস্থির। এতো আর নতুন নয়, বল মা, আমরা কি কোনদিন আলাদা থেকেছি।' আরতি উকিল গিন্নিকে ডেকে বলল, 'দেখেছ দিদি ছেলেরা শুধু নিজেদের কথা ভাবল, আমাদের কথা একবারও ওদের ভাবনায় এলো না। ওরা দু'ভাই পড়তে চলে গেলে আমাদের দু মায়ের কি অবস্থা হবে সেটা কি কখনও ভেবেছিস? সরলা বলল, দেখ দিদি তুমিই দেখ, আমি আর দেখতেও চাই না। ভাবতেও চাই না।'

ছেলেরা পড়তে ঢাকা যাবে বলে দুই মা মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করে আবার ছেলেদের জিনিসপত্র গোছগাছ করে বসে বসে কাঁদে। কান্না থামিয়ে ছেলেদের বিছানাপত্র, ব্যাগ কাপড়-চোপড় একবার গোছায় আবার খুলে নিচে নামায়। ওদের মাথায় কোন কাজ করছিল না। বারবার শুধু গোছাচ্ছেই এমন সময় উকিল বাবু ঘরে ঢুকে দুজনকেই জোরে ধমক দিয়ে বলল, 'তোমরা একি করছ, ছেলেরা কি বিদেশ যাচ্ছে যে ছয় মাসের মধ্যেও তাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না।' ধমক খেয়ে ওদের আবেগ বেড়ে গেল, আরও জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করল। ওদের কান্না দেখে উকিল বাবু প্যানপ্যান করতে করতে ঘর থেকে বের হতে হতে বলল, 'কান্না থামাও ছেলেরা তো আকাম করতে যাচ্ছে না। পড়তে

যাচ্ছে তাতে কান্নার কি আছে? আশীর্বাদ করে দাও, ওদের খাইয়ে রেডি করে দাও। আমিও যাবো ওদের সঙ্গে।'

সমর বলল, 'জ্যাঠা তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে, বেশ হয়েছে।' জ্যাঠু বলল, দুজনের এত জিনিস হয়েছে, তাই গাড়ি নিতে হবে। সমরের মা ও বড় মা দুজনেই খুশি হলো, উকিল বাবু সঙ্গে গেলে ঘরদোর ঠিকমত গুছিয়ে দিয়ে আসতে পারবে। সমর বলল, 'জ্যাঠু তুমি আমাদের সঙ্গে আজ রাত থেকে কাল চলে আসবে।' জেঠু হাসতে হাসতে বলল, 'বেশ তাই হবে, আমার তো আর কাজ নেই। ছেলেদের পিছনেই পরে থাকি।'

৪র্থ অধ্যায়

দেখতে দেখতে সমর ও অমরের দু' বছর কেটে গেল। মায়েদেরও চিন্তা অনেকটা কম হয়ে এলো। পরীক্ষা দিয়ে দুজনেই বাড়ি ফিরে এলো। একদিন দুপুর বেলায় আরতি খেয়ে-দেয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর সমর মায়ের পিছন দিয়ে এসে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। মা পিছন দিকে ফিরে শুয়ে ছেলের গায়ে হাত দিয়ে আদর করে বলল, কিরে বাপ কি মনে করে আজ এখানে এলি? সমর বলল, 'মা তুমি যেন কেমন দিনদিন দূরে সরে যাচ্ছ আর পর হয়ে যাচ্ছ। তোমার কাছে একটু শুবো তাও কেমন করছো।' 'মা কখনো কেমন করে নারে বাপ, সর্বদা তার নাড়ীছেঁড়া ধনকে আদরই করে।' সমর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মা আমাদের এ কলঙ্ক কি সারাজীবনভর বয়ে বেড়াতে হবে?'

– কীসের কলঙ্ক?

– এই যে সবাই বলে, তোর মা উকিল বাড়ির কাজের মাসী রাঁধুনী।

– লোকেরা তো হিংসায় মরে যায়। তাই নানা কথার সৃষ্টি করে থাকে। নিজের সংসারেও তো কাজ করে খেতে হয়। দেখিস না তোর বড় মা তার সংসারে কত কাজ করে। লোকে বলে বলুক। তোর জ্যাঠা মানুষ নয় রে দেবতা। এত ভাল মানুষ আমি জীবনেও দেখিনি, কি তার ব্যবহার, কি বদান্যতা, কি উদারতা একটা মানুষের মধ্যে। তোর নিজের কাকা জ্যাঠা দু'মুঠো ভাতের জন্য আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর তোর উকিল জ্যাঠা রাস্তা থেকে আমাদের কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছে। শুধু আশ্রয় নয়। সর্ব রকম সহায়তা করেছে। তোর বাপেও হয়তো এতখানি করতে পারত না। আর এই দেবতুল্য মানুষটি তোর খাওয়া পরা লেখাপড়া সবকিছুরই ভার নিয়ে তোকেও মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে।

কাঁদো কাঁদো হয়ে সমর বলল, 'মা এ ঋণ আমি কোনদিনও শোধ করতে পারবো না।'

– কাঁদিসনে বাপ, ভগবান এর একটা উপায় করবেই।

মা যখন তার সন্তানকে বুকের কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছিল তখনই অমর ঘরে ঢুকে বলল, 'বা! খুব তো মায়ের আদর খাওয়া হচ্ছে, সর-সরে যা, আমি এখানে শুবো।'

– তোকে শুতে দিলে তো! তুই যখন তোর মায়ের আদর খাস তখন কি আমি তোকে বিরক্ত করি? ওঠ বলে অমর সমরকে টেনে তুলে দিল।

– ওমা দেখেছ ওর কাণ্ড, কেমন করছে।

আরতি দুজনের দু'হাত ধরে বলল, তোরা দুজনেই আমার কাছে শুয়ে থাক, ছোট বেলায় যেমন শুতিস। অমর খুশি হয়ে বলল, হ্যাঁ তাই হবে, কাকিমার কথাই ঠিক। কাকিমা তুমি মাঝখানে শুবে আর আমরা দুজনে দুপাশে শুবো। দুই বন্ধু আরতিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল।

পরীক্ষার ফল বের হয়েছে, দুজনেরই ফল খুব ভাল। টাঙ্গাইলের আদালত পাড়ার মধ্যে এ যাবৎ এত ভাল ফল কেউ করেনি, সবাইতো আনন্দে আত্মহারা। ওদেরকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করতে হবে। সে ব্যবস্থাও চলতে লাগল। এবার আর বাবাকে চেষ্টা চালাতে হবে না, ওরা দু'ভাইই সবকিছু করতে পারবে। এর মধ্যে অমরেশকে রাজনীতির অভ্যাসে পেয়েছে, সময় পেলেই সে রাজনীতির আড্ডাখানায় যোগ দেয়।

যতীন বাবুর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা তার গ্রাম সুরুজে একটি কলেজ তৈরি করে দিবে। স্কুলটি তৈরি করেছে যতীন্দ্র নাথের বাবা নগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। আর এবার কলেজটি তৈরি করতে যাচ্ছে যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর বাবা নগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর নামে। এ উপলক্ষে সুরুজ গ্রামে গণ্যমান্য ব্যক্তি, সা'দত কলেজের প্রিন্সিপাল, কুমুদিনী কলেজের প্রিন্সিপাল, ঢাকা ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, বাংলা বিভাগের ডিন প্রমুখ ব্যক্তিকে কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন দিবসে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এক সপ্তাহ পরেই কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। ঐদিনই ভিত্তি প্রস্তরের পর অমরেশ, সমরেশ ও টাঙ্গাইল জেলার আরও ১০ জন ছাত্র ও তিন জন ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

সুরুজের বাজারের পশ্চিমপার্শ্বে যে খোলা একুশ একর জমি পতিত আছে। সেটাই চক্রবর্তীদের জমি। ঐ জমিটাতে যতীন্দ্র বাবু তার বাবার নামে কলেজ করার মনস্থ করেছে। গ্রামের ও আশেপাশের গ্রামের লোকেরা তার এ সিদ্ধান্তে অত্যধিক আনন্দিত হয়েছে। যেখানে কলেজ করা হবে সেখানে মাটি ভরাট করা

হচ্ছে। শতাধিক কামলা কাজে নিয়োজিত। ঐ জমিটা লোকারণ্য হয়ে রমরমা হয়েছে। বহুলোক ঐ পথ দিয়ে যাতায়াতের সময় খানিকটা দাঁড়িয়ে দেখে কি হচ্ছে। গ্রামে তো আর মাটির অভাব নেই। তবুও ডিগ্রি কলেজ বলে কথা। তখনকার দিনে গ্রামগঞ্জে খুব একটা কলেজ ছিল না। সুরুজ এমনিতেই ছোটখাট একটা গঞ্জ। বর্ষাকালে নদীর পার দিয়ে নৌকা করে নানা পসরা বসে এবং খালের দু'তীর দিয়েও নানা রকম পসরা বসে। মনে হয় যেন এটা একটা ব্যবসা কেন্দ্র। বর্ষাকালে সুরুজকে মনে হয় একটা বাণিজ্য ক্ষেত্র।

দুই বন্ধু একত্র মিলে কলেজের জায়গার সৌন্দর্য বর্ধন করতে ব্যস্ত। প্রতিদিন সকাল বেলা কিছু খেয়ে দু'বন্ধু কলেজের ভিত্তি প্রস্তুত করার জন্য যায়, আর বিকেলে কামলাদের দেনা পাওনা শোধ করে সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল ফিরে আসে। ৭ ই জানুয়ারি সকাল ১০ টায় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান শুরু হবে। তার আগের দিনই সমস্ত ডেকোরেশন শেষ করা হয়েছে। নানা রং এর ফুল ও কাগজ দিয়ে এবং আলোর সমারোহ দিয়ে ঝকঝকে এবং আড়ম্বরপূর্ণ করে অনুষ্ঠান মঞ্চ সাজানো হয়েছে। দু বন্ধু এমন নয়নাভিরাম করে সাজিয়েছে, কেউই চোখ ফিরাতে পারে না।

অনুষ্ঠানের দিন গ্রামের ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এলেন। আমন্ত্রিত অভ্যাগতরা প্রায় সবাই উপস্থিত হয়ে তারা ডেকোরেশন ও অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করল। কলেজটি যাতে সুনামের সাথে কার্যকারিতা চালাতে পারে এবং চৌকস ছাত্র-ছাত্রী যেন এই কলেজ থেকে বের হয়ে আসে, সেজন্য সবাই আশীর্বাদ করল। চতুর্দিক থেকে যতীনবাবু ও তার পরিবারকে এমন মহতী কাজের জন্য প্রশংসা করল ও ধন্যবাদ জানাল।

কলেজের ভিত্তি স্থাপন করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ডিন শ্রী শ্যামাচরণ মিত্র। সমবেত হাত তালির মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরপরই শুরু হলো কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উঠে আসল সমরেশের জীবনী ও সাফল্য। সবাই সেদিন খুব ভাল করে প্রথমে জানতে পারল উকিল বাবুর মুখ থেকে। সুরুজের পাশাপাশি গ্রাম বার্তার ভট্টাচার্য বাড়ির মুকুন্দ বিহারী ভট্টাচার্যের ও আরতি ভট্টাচার্যের একমাত্র পুত্র সমরেশ ভট্টাচার্য। অনেকে এ সম্বন্ধে কিছুই জানত না বলে অবাক হয়ে গেল। সমরেশের উন্নতির কথা বলতে গেলে যতীন বাবুর মহানুভবতার কথা বেরিয়ে আসবে। উকিল বাবুর উদারতা প্রকাশ পাবে গ্রামবাসীর বক্তব্যের মাধ্যমে। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই উকিল বাবুকে খুবই শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। সেই সুবাদে চক্রবর্তী বাড়ির সবাইকে গ্রামবাসীরা আপনজনের মত শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সবাই গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যার যার বাড়ি চলে গেল। উকিল বাবু

সারাদিনের কাজ করার জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করেছিল। সেই গাড়িতে করেই তিন খ্যাপ দিয়ে সর্বশেষ খ্যাপে সমরেশ ও ওর বন্ধু-বান্ধবরা টাঙ্গাইল এসে পৌঁছাল। অমর ও সমরের কয়েকজন বন্ধু এসেছিল। ওদের জন্য রাতে রান্না হয়েছিল। সবাই মিলে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কারণ সারাদিনে দারুণ খাটাখাটি গিয়েছে। আবার সকাল বেলাতেই ওদের ঢাকায় রওনা হতে হবে।

গ্রামের কয়েকজন লোকও টাঙ্গাইলের বাসায় এসেছিল। তারা ওদের আত্মীয় স্বজন, সবাই উকিল বাবুর যথেষ্ঠ প্রশংসা করেছিল। সে কথাই গিন্নিকে এসে বলল এবং শুধু প্রশংসা নয় গ্রামবাসীরা উনাদের আশীর্বাদ করেছিল। এতদিন ওরা জানত না উকিল বাবু কি মানুষ, তার মধ্যে মনুষ্যত্ব কতটুকু এবং অনুষ্ঠান দেখে গ্রামবাসীরা সত্যি সত্যি খুব ভাল করে বুঝতে পেরেছে উকিল বাবুর মহানুভবতা ও ঔদার্য।

৫ম অধ্যায়

দুই বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এত ভাল ফল করেছে, সেজন্য দুজনেই অনার্সে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনায়াসে ভর্তি হয়ে জগন্নাথ হলে আরামদায়ক স্থানে সিট পেয়েছে। ওরা ভর্তি হয়ে মা-বাবার কাছে টাঙ্গাইল চলে এসেছে। অমরের একটা ছোট বোন আছে তার নাম অনিমা। কুমুদিনী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট-এ পড়ে। সে মোটামুটি ভাল ছাত্রী। মা-কাকির এত আহ্লাদে বড় হয়েছে যে আহ্লাদে তার মাটিতে পা-ই পড়ে না। মা তাও দু' একটা কাজ মেয়েকে শিখাতে চায় ও চেষ্টা করে কিন্তু কাকিমা তাকে কোন কাজেই হাত দিতে দিবে না। অনিমার মা বলে, 'দিদি এত আস্কারা দিও না। মেয়েদের কাজ শিখে রাখা খুবই প্রয়োজন। সংসারে কাকে কোন প্রয়োজনে লাগে বলা তো যায় না।' ওর কাকিমা বাঁধা দিয়ে বলল, থাক না ও সমস্ত কথা। আমাদের মেয়ে লেখাপড়া করবে, ভাল চাকরি করবে। ভাল বর ভাল মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে সুখে সংসার করবে। মেয়েদের সুখী হতে এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না। আর যদি আমাদের উকিল বাবুর মত স্বভাব চরিত্রে সৎ গুণের অধিকারী একজন নির্মল মানুষ হয় তাহলে তো কথাই নেই। এই বয়সেই অনিমার পাত্র খোঁজা হচ্ছে। মা চায় অল্প বয়সেই কন্যার বিয়ে দিবে। কাকিমা ও উকিল বাবু চায় মেয়ের একটু বয়স হোক ভাল-মন্দ বুঝতে শিখুক। ভালভাবে যেন সংসারের হাল হকিকত বুঝতে পারে কিন্তু মায়ের কথা-মেয়েরা জন্ম থেকেই মা হয়ে জন্মায়। অনেক কিছুই তারা আপনা-আপনি শিখে ফেলে। আর কাকিমার কথা হলো– তবুও আগে থেকে জানা থাকলে ভাল, তাতে ভবিষ্যতে কোন রকম অসুবিধায় পড়তে হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ার সময় অমর সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পরে। সমর সর্বদা তার মায়ের মুখখানা মনে করে। কীভাবে মাকে খুশি করতে পারবে। সে চেষ্টাই শুধু সে করে। তাই লেখাপড়া ছাড়া সে আর অন্য কোন কিছুতে মন দেয় না। আর অমরের কথা লেখাপড়া তো করবই। দেশের ও ছাত্রদের এই সংকটময় মুহূর্তে হাত গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। দেশও বাঁচাতে হবে। ছাত্রদেরও মঙ্গল করতে হবে এবং নিজের লেখাপড়াও চালিয়ে যেতে হবে। আগে কিন্তু অমর এত কর্মঠ ছিল না। লেখাপড়া ও খেলাধূলা নিয়েই থাকত। ইদানিং রাজনীতির উপর ঝোঁকটা একটু বেশি হয়েছে। ছাত্র সংগঠনের উপর ভীষণ জোর দিয়েছে অমর।

থ্রি ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্স বাতিলের জন্য তুমুল ছাত্র-আন্দোলন, এমন জোর আন্দোলনে অমর অংশগ্রহণ করছিল, যাতে তার লেখাপড়া তো বাদই গিয়েছিল। তার উপর খাওয়া-দাওয়ার সময় পাচ্ছিল না। মাঝে মাঝেই সংগঠনের কাজে তাকে বাইরে থাকতে হচ্ছিল। রাজনীতিতে এমনভাবে ডুবে থাকার জন্য অমরের বাবা-মা দুজনেই চিন্তান্বিত ও অখুশি। এজন্য ছেলেকে তারা নানাভাবে বুঝিয়েছে, রাজনীতি ভালবাসো কর কিন্তু এত সক্রিয়ভাবে নাওয়া-খাওয়া, লেখাপড়া বাদ দিয়ে একটা নিয়ে পড়ে থাকলে তো সংসার চলবে না। বাবা-মার প্রতিও তো তোমার কর্তব্য আছে। তাদের দিকেও তোমার দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া পূর্ব-পুরুষের সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্বও তো তোমার।

রাজনীতি দু' বন্ধুকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সমর খুবই সংসারী এবং রাজনীতি সে মোটেই পছন্দ করে না। তবুও অমর যে মিটিং ও মিছিলে সমরকে যেতে বলে, সমর আন্তরিকতার সাথে বন্ধুর মান রক্ষার্থে যায় এবং বন্ধুর সঙ্গে বক্তৃতার ভালমন্দ সমালোচনা করে। অমর স্পষ্টবক্তা। সে সত্য কথা বলতে বা তার যেটা পছন্দ নয় সেটা মুখের উপর বলতে দ্বিধা বোধ করে না। অমর মাঝে মাঝে সমরের বিছানায় শুয়ে পড়ে বলে, 'সমররে তুই যে লেখাপড়ায় আমাকে ডিঙিয়ে যাবি। এবার তোর সমান রেজাল্ট করতে পারবো না। তাতে আমার আত্মীয়-স্বজন, বাবা-মা বন্ধু-বান্ধব এমন কি তুইও মনে দুঃখ পাবি।' সমর বন্ধুর পাশে একটা বালিশ টেনে নিয়ে পিঠের উপর হাত রেখে বলল, – যদি সবই বুঝিস, তাহলে এতগুলো লোককে কেন দুঃখ দিচ্ছিস?

– তুই তো সবই বুঝিস বন্ধু। তবুও আবোলতাবোল বলছিস কেন। আমি যে রাজনীতিকে ভালবাসি। দেশকে, দেশের জনগণকে ভালবাসি, তুই তো সবই জানিস, আমার প্রাণের কথা জানিস, তাইতো তুই আমার প্রাণের বন্ধু।

– সবই বুঝি, জ্যাঠাবাবু ও বড়মার কথা ভাববি না। সব হবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাজনৈতিক বন্ধুবান্ধবের অমরদের বাড়ি যাতায়াত সবসময়ই আছে এবং এ বাড়িতে এসে ওরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ছেলের বন্ধুদের তো আর না করা যায় না। ওরাও তো পুত্রতুল্য। এ সমস্ত ভেবেচিন্তে বাড়ির বড়রা ঠিক করল অনিমাকে অতিশীঘ্রই বিয়ে দিবে। অনিমার তেমন কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছিল না। যতীন বাবু লোক দিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাত্রের সন্ধান করাতে লাগল। বাবার এ ব্যবস্থা নেওয়াতে অমর মনে মনে খুশিই হলো। কেননা সে চায় না সংসারের কোন ঝামেলা তার উপরে এসে পড়ুক আর উকিল বাবুও চায় সংসারের সমস্ত ঝামেলা ও দায়-দায়িত্ব নিজে বহন করতে। অমরকে উকিল বাবু প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। তাই তো লাগামহীনভাবে তাকে ছেড়ে দিতে পারে না।

১৯৫৮ সালে অস্ত্রের বলে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করবার পর থেকে নানা ভাবে বঙ্গবন্ধুর উপরে সামরিক শাসনের আক্রোশ পড়তে থাকে। যার ফলে আইয়ুবের দশবছর রাজত্বকালের মধ্যে ৮ বছরেই শেখ মুজিব নানা ভাবে নানা অজুহাতে কারাগারে আবদ্ধ থাকে। শেখ মুজিবের সঙ্গে তার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগও ৬ দফা ও ১১ দফায় যোগ দিয়ে আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে দেয়। অমরও এ ছাত্র আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল। সশস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যখন শেখ মুজিব কারাগারের বাইরে থেকেছে তখনই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে সে ভাষণ দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন হতে হবে ৬ দফার ভিত্তিতে। এটাই ছিল আওয়ামীলীগের আসল দাবি।

আইয়ুব খান যখন দেখতে পেল শেখ মুজিবকে কিছুতেই বশে আনা যাচ্ছে যাচ্ছে না, তখন চতুরতার সহিত আরেকটা মামলা তার বিরুদ্ধে জারি করা হলো, সেটা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কারণ পাক সামরিক বাহিনী বুঝতে পেরেছিল শেখ মুজিবকে কোনমতেই দমিয়ে রাখা যাবে না। ষড়যন্ত্রের পথ তৈরি করে তাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করতে হবে। সেখানেই নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করেছিল। কিন্তু তৎকালীন ছাত্র রাজনীতিও খুব বলিষ্ঠ ছিল এবং ছাত্ররাও খুব তুখোড় ছিল।

বৃটিশ আমল ও পাকিস্তান আমলে সংসারের নিয়ম কানুন একরকম ছিল। আর বর্তমানে সংসারের নিয়ম কানুন অন্যরকম। তখনকার দিনে বাবা-কাকারা সারাজীবন উপার্জন ও পরিশ্রম করে তাদের বাবা-মাদের খাওয়াবে, সেবা যত্ন করবে এবং সন্তান প্রতিপালন করবে। তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা আরাম আয়াসে দিন অতিবাহিত করবে এবং সন্তানদের প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করবে। আর বর্তমানে বাবা-মার দায়িত্ব ঠিকই আছে। প্রাণপাত করে তারা পুত্রের লেখাপড়ার যোগান দিবে এবং উন্নততর জীবন যাপনের ব্যবস্থাও করে দিবে। কন্যা সন্তানের জন্য সুপাত্র খুঁজে টাকা খরচ করে, ঋণ করে বিয়ের ব্যবস্থা করবে ঐ বাবা-মাই।

এগুলো সব ঠিক আছে। শুধু ঠিক নেই পরের নিয়ম কানুন। সেটা কি? ছেলেরা লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি করবে শহরে গিয়ে ফ্ল্যাট কিনবে। বিয়ে করে স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুখে বসবাস করতেই তারা বেশি পছন্দ করে। আর মেয়েদের কথা কি বলবো, তারা তো পরের অধীনে পরাধীন হয়ে বাস করে, তাদের মতামতের দামই বা কতটুকু। যদি মা-বাবার কপাল নিতান্তই ভাল হয়ে থাকে, তবে ছেলে-মেয়ে দু'তরফের পক্ষ থেকে তাদের কপালে আদর যত্ন ও সুখ জুটে কিন্তু বর্তমান জামানা অন্যরকম।

যতীনবাবু সংসারের প্রত্যেকটি লোককে সমর ও সমরের মাসহ সবাইকে আপন ভেবেই লালন পালন করে আসছে। বাড়ির চাকর-বাকর আয়া প্রত্যেকের প্রতি বিশেষ নজর রাখে। এইতো গত বছর ওদের সংসারের ৪০ বছরের চাকরের মেয়ের বিয়েতে ৪০ হাজার টাকা নগদ দিল। আপন ভেবেই তাদের দুঃখের দিনে সাহায্য করে থাকে। পাড়া প্রতিবেশীদের দুঃখেও সে দুঃখিত হয়। এত সুন্দর মনের জন্যই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই তাকে খুব ভালবাসে।

উকিল বাবু নিজের কথা না ভাবলেও স্ত্রী সরলা ও সমরের মা আরতির ভবিষ্যৎ ভেবে ওদের দুজনের জন্য ব্যাংকে কিছু টাকা রেখে দিলেন। কিন্তু সে কথা কাউকে কিছুই বলেনি। সরলা ও আরতিকেও বলেনি।

১৯৫২ সাল থেকে ভাষা আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়েছে ছাত্র আন্দোলন। শেখ মুজিবের প্রতিটি দাবি ছিল যুগোপযোগী এবং বাস্তব সত্য। তাই তখন জনতাও ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনে। আস্তে আস্তে ছাত্র আন্দোলন দানা বাঁধতে বাঁধতে তুঙ্গে উঠে আসে। তারপর ৬ দফা ও ১১ দফা নিয়ে আন্দোলন জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রূপ নিতে থাকে। এই আন্দোলনকে ঢাকাসহ সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। অমরের দিনরাতে একটুও সময় নেই। ছাত্র সমাজের ছাত্র আন্দোলনে এমনভাবে মিশে গেছে। সমর মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে বলে, 'এরকম করলে কি করে চলবে। দুদিন টাঙ্গাইল গিয়ে বাবা-মায়ের কাছে থেকে আয়।' যতীনবাবুও চিঠি লিখে বাড়ি আসতে বলে দিলেন। লক্ষ্মী ছেলের মত বাবার কথা শুনে টাঙ্গাইল চলে এলো। কিন্তু এলে কি হবে ঢেকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। অমর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। টাঙ্গাইল এসে পুরাতন বন্ধু-বান্ধব পেয়ে তাদের নিয়ে নতুন উদ্যমে রাজনীতির কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। প্রতিদিন মিটিং মিছিল লেগেই আছে। এরই মধ্যে মিছিলে ছাত্ররা স্লোগান দিতে দিতে পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাম অফিস ও টেলিফোন অফিসে ঢুকে তারটার ছিঁড়ে যখন নানা উৎপাত করছিল, তখন অমরসহ অন্য ছেলেরা পোস্ট অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ ওখান থেকেই ওদের গ্রেফতার করল।

বঙ্গবন্ধু সঠিক সময়ে সঠিক আন্দোলন করেছিলেন বলেই বাংলার ছাত্ররাও সঠিকভাবে মুজিবের পতাকাতলে সমবেত হয়ে আন্দোলনকে তুমুল তরঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। ৩/4 দিন জেলে থাকার পর জামিনে অমর বের হয়ে আসে। অন্যকোন মামলায় ওকে ফাঁসিয়ে দিয়ে আবার কারাগারে নিক্ষেপ করে।

১৯৬২ সালের হামিদুর রহমানের শিক্ষা কমিশন রির্পোট বাতিল আন্দোলন, ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ১১ দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বহুবার কারাবরণ করে। স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও কুখ্যাত গভর্নর মোনায়েম খান বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আবারও কারাবরণ করে। ছাত্রদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের সংগ্রামেও অগ্রণী নেতৃত্ব প্রদান করে। অমর যখন কারাগারে থাকে, তখন যতীনবাবু কিছুতেই শান্তি পান না। যদি জামিনের জন্য পুত্রের পক্ষে না দাঁড়ায় তখনও লোকেরা বিশেষ করে মুসলিমলীগের উকিলরা বলে, দেখ এমনই বেয়াদপ ছেলে যার পক্ষে বাবাও দাঁড়ায় না। আর সে রাজনীতি করা পছন্দ করে না বলে ছেলের পক্ষে দাঁড়ানো নিজেই পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় সে শাখের করাতের মধ্যে পড়েছে। তথাপি লোকচক্ষু, লোক নিন্দা সবকিছুর উর্ধ্বে ছেলে যেমন করেই হোক ছেলেকে বাঁচাতে হবে। মনের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক করে যতীন বাবু যেদিন প্রথম ছেলের জামিনের জন্য কোর্টে আর্জি পেশ করল তখনই মুসলিমলীগের উকিল সৈয়দ আব্দুস সামাদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একি উকিল বাবু এতকাল তো জানতাম আপনি নিরপেক্ষ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন এখন দেখতে পাচ্ছি ছেলের সঙ্গে সঙ্গে আপনিও আওয়ামীলীগে নাম লেখালেন।'

খোঁচা দেওয়া কথা শুনে উকিল বাবু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু নিজেকে জোর করে শান্ত রেখে বলল, 'আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম। আমার ছেলে তো কোন অন্যায় করেনি। দেশের মঙ্গলের জন্য, জনগণের সুখ শান্তি ও ন্যায্য অধিকারের জন্য এটা জনতা ও ছাত্র সমাজের দাবি। যে দাবিকে সচেতন ব্যক্তিমাত্রই সমর্থন দিবে। আমি তাদের দাবিকে সম্মান ও সমর্থন করে অমরের জামিন দিতে হুজুর সমীপে আবেদন জানাচ্ছি।'

বাবার হয়ে এহেন আবেদনের সম্মুখীন হয়ে অমরতো দারুণভাবে বিস্মিত হয়ে বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ল। বাবার এমন আচরণ কোনদিনও দেখেনি। অমর ভেবেছিল বাবা না জানি তার বিরুদ্ধে কত কুরূপ মন্তব্য করবে, গ্রেফতার না হলে বাবার স্বরূপ কিছুতেই জানা হতো না। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অমর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। যতীন বাবুও তার কান্না সংবরণ করে রাখতে না পেরে অন্যদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে চোখের জল মুছে ফেলতে লাগল। কোর্টের মধ্যে এ অবস্থায় সত্যিই একটা

আবেগপ্রবণ পরিবেশের সৃষ্টি হলো, চতুর্দিকে নীরব-নিস্তব্ধ। এতই নীরব যে পিন পতন শব্দও শোনা যাবে। যতীনবাবু নিজে মাথা খাড়া করে আবার তার আর্জি পেশ করল। তখন সমস্ত কোর্ট যতীনবাবুর গলার আওয়াজ শুনে যার যার চেয়ার ঠিক করে পুনরায় বসে পড়ল। পরবর্তীকালে জজ সাহেব জানালেন আগামী কাল জামিন সম্বন্ধে তিনি সিদ্ধান্ত নিবেন। আজকের মত কোর্টের কাজ স্থগিত হলো।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

উকিল বাবু এবার চাইলেন, মেয়েটিকে সৎপাত্রে দান করবে। পাত্রের খোঁজ এক মক্কেল নিয়ে এলো। রাজশাহী শহরে পাত্রের বাড়ি। পাত্রের বাবাও উকিল এবং পাত্রও সবে ওকালতিতে ঢুকেছে, বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যে উচ্চ কুল সম্পন্ন। দেখে যদি পছন্দ হয় করবেন। শুনেই উকিল বাবুর পছন্দ হয়েছে। আরতিরও পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হয়নি শুধু সরলার। উকিল বাবু জানতে চাইল–

– কেন তোমার পছন্দ হয়নি বল তো?

– উকিল বলে।

– উকিল কি দোষ করেছে?

– অনেক দোষ করেছে।

– হ্যাঁ অনেক দোষ করেছে মানলাম, কিন্তু সেগুলো কী কী?

– এত জবাব আমি দিতে পারব না। চাকরি করলেও একটা কথা ছিল। চাকরি করবে, ছুটি পাবে, বৌকে নিয়ে এখানে সেখানে বেড়াতে যাবে।

– কোথায় কোথায় বেড়াতে যাবে?

– যেমন সমুদ্র সৈকত-পুরী কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন।

– ও.. আচ্ছা– ওগুলোর একটাও যাওয়া হয়নি। তাই কি? মথুরা বৃন্দাবন যাওনি বলে কি যাওয়া হবে না। তোমাকে দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরে, ময়নামতীতে, কুয়াকাটা, সিলেটে মহাপ্রভুর জন্মস্থানে নিয়ে গিয়েছি। যাক তুমি যেখানে যেতে চাইবে সেখানেই নিয়ে যাব হলো তো?

– ঠিক আছে। ফলে পরিচয়তো।

– এবার সব জায়গায় নিয়ে গেলে তো আর উকিলের কোন দোষ থাকে না?

– বললামইতো দেখা যাবে।

উকিল বাবু বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোকদের দিয়ে রাজশাহীর পাত্রের খোঁজ নিতে লাগল। পরিবারের চেয়ে ছেলের পরিচয় বেশি করে নেওয়া দরকার। আধুনিক যুগে আধুনিক হাল ফ্যাশনের ছেলেই তো মানানসই হবে। চতুর্দিক থেকে উকিল বাবু লোক লাগিয়ে দেখল ছেলে যথার্থই উপযুক্ত। এবার নিজেই যাবে পরখ করতে।

একদিন সন্ধ্যার দিকে উকিলবাবু বাড়ি এসে সরলাকে ডেকে বলল, 'লোকজন যাদের পাঠিয়েছিলাম, তারা সবাই এসে এত তারিফ করল, তা শুনে আমি খুব খুশি। হ্যাঁ মনে হচ্ছে, এখনই গিয়ে বিয়ে ঠিক করে আসি। গিন্নি বলল, 'আর একটু ভাবো, একটা কথা আছে 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।'

– এত ভাবতে পারবো না।

– ভাবতে তো তোমাকে হবেই। মেয়েকে তো জলে ফেলে দিতে পারবো না।

– তোমার বেলায় তো এত ভাবিনি, পছন্দ হয়েছে বাবাকে বলেছি, বাবা কোন আপত্তি না করে তোমাকে এনেছে, তাতে কি কোন খারাপ হয়েছে?

– হয়েছেই তো! আমার মেয়ের বেলায় আরও ভাল করে দেখে শুনে তারপর বিয়ে দিবে।

– যত দেখাশোনা করে ভালপাত্র দেখে দাও না কেন, কপালে যা আছে তা ঘটবেই।

– এটাতো সর্বোচ্চ কথা, কপালের লিখন না যায় খন্ডন। কিংবা জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে।

উকিল বাবু হেসে হেসে বলল, 'তা'হলে দিন ঠিক করে আমরা বরের বাড়ি যাবো। তুমি তোমার বিধাতার (উকিল বাবুর) উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পার।'

– কি বললে? হায় ভগবান, আমি কোথা যাই?

– কেন, কেন? তুমি এতদিন এই বুড়োকে নির্ভর করে নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটিয়ে দাওনি? সংসারের কোন ঝুট ঝামেলা কি তোমাকে বইতে হয়েছে? সংসারের কোন ঝামেলাটা তুমি নিশ্চিন্তে বহন করেছ। সব কিছুতেই না উকিল বাবু, উকিলবাবু করেছ।

– ও- এখন এই কথা, স্বামীর অনুমতি নিবো না, সেই আমার বিধাতার অনুমতি ছাড়া কি কোন কাজ করা যায়?

– সবইতো বোঝ, তাহলে এত কথা কেন?

– ও আমি শুধু কথা বলি? আর নিজের বেলায়?

বলেই রাগত অবস্থায় ছুটে চলে গেল সরলা।

দু'দিনের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে বরের বাড়ি যাবার প্রস্তুতি নিল যতীনবাবু। অমর আর সমরকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু তারা কিছুতেই রাজি হলো না। দু'বন্ধুই বলল, 'আমাদের পড়াশুনার অনেক ক্ষতি হয়েছে, তোমরা গুরুজনেরা ভাল বুঝবে, তোমরা যেটা করবে, সেটাই মঙ্গল হবে, ভাল হবে। তাছাড়া কলেজের বিল্ডিংয়ের কাজটাও তো তাড়াতাড়ি সারতে হবে। ওটাও আমাদের উপরেই তো ভার দিয়েছো। ও দিকটার ভালমন্দ আমাদেরই দেখতে হবে।'

দুদিন পরে রাজশাহী থেকে ফিরে এসে উকিল বাবু খুবই খুশি। জানো গিন্নি ও আরতি তোমাদের মেয়ে অনিমার কপাল খুবই ভাল। আমি যেমন ঘর-বর চেয়েছিলাম তেমনই পেয়েছি। আমার মা আয় তোকে একটু দেখি। অনিমা এসে বাবার সামনে দাঁড়াল, বাবা মেয়েকে আদর করে বলল, মা তুই দেখিস, সত্যি তুই ভাগ্যবতী হবি। মেয়েটা লজ্জা পেয়ে ওখান থেকে সরে ঘরে চলে গেল।

– জানো গিন্নি, আমি ওদের বলে এসেছি। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এর মধ্যে দিন ঠিক করে আমাকে জানিয়ে আপনারা আমাদের বাড়ি যাবেন। আপনাদের কনে পছন্দ হলে আমাদের ওখানেই বিয়ের পাটিপত্র সব ঠিক করব। আপনারা সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন। আমার মনে হয় ওদেরও পছন্দ হবে। আমার লক্ষ্মীমন্ত মেয়েকে সবাই পছন্দ করবে। তুমিও মনে মনে প্রস্তুতি নিতে থাকো। মেয়ের বিয়েতে কি কি গয়না দিবে। তার নকশা ঠিক করে রাখো। আত্মীয়স্বজন কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করবে সেটাও ঠিক করে রেখো। প্রণামী কীভাবে দেওয়া হবে সেটাও আমাকে জানিয়ে রেখো। মোট কথা বিয়ের সমস্ত প্রস্তুতি কিন্তু তোমাকেই নিতে হবে।

দু'পক্ষের যখন মতের মিল হয়েছে কোন কিছুতেই কোন কথা কাটাকাটি হয়নি সেখানে তাড়াতাড়িই বিয়ে হওয়ার কথা। কেউ কোন আপত্তি জানায়নি। দুপক্ষই ভীষণ ভদ্র এবং সভ্য, সেখানে আপত্তির কোন কারণ নেই। শ্বশুর বলল, 'আমাদের চাওয়ার কিছু নেই, আপনাদের মেয়েকে যা দিয়ে খুশি তাই দিয়ে সাজিয়ে দিবেন। কিন্তু আজকে আমার একটা দাবি আছে। মাকে দুটো গান গাইতে হবে, শুনেছি মা ভাল গান গায়। প্রথমটা ভজন কিংবা কীর্তন ২য়টা আধুনিক।' অনিমাও রাজী হলো প্রথম গান কীর্তন গাইলো শ্বশুরকে খুশি করার জন্য এবং ২য়টা আধুনিক গাইল হবু বরকে খুশি করতে। বরের বাড়ির সবাই সন্তুষ্ট হলো। বিশেষ করে কনের বাবার ব্যবহারে। বর অনিমেষ গাঙ্গুলী বাড়ি যাওয়ার আগে কনের বাড়ির সবাইকে বাবা মা, দাদা ইত্যাদি ডেকে সন্তুষ্ট করে

গেল। সবাই বলাবলি করতে লাগল, বর যেমন সুন্দর, ব্যবহারও তেমন মধুর। আমাদের মেয়ে লাজুক ও মুখচোরা। যাকগে ছেলেই সব ঠিক করে নিবে।

পনের দিনের মধ্যে অনিমা ও অনিমেষ গাঙ্গুলীর বিয়ে ধুমধাম করে হয়ে গেল। প্রচুর নিমন্ত্রিতরা এসেছিল। সবাই খেয়ে দেয়ে খুব প্রশংসা করল। অনিমা ও অনিমেষকে বিয়ের পর বিদায় করে দিয়ে বাড়িসুদ্ধ সবাই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বিয়ে বাড়িতে এমন করে কেউ কোনদিন কাঁদতে দেখেনি। গাড়ি থেকে যতদূর দেখা যায় অনিমা অপলকনেত্রে তাকিয়ে দেখছে আর কাঁদছে।

বিয়ে নির্বিঘ্নে মিটে যাওয়ার পর আত্মীয়-স্বজনরাও আস্তে আস্তে চলে গেল। এদিকে দুই বন্ধু সমর ও অমর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। তাদের লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। বাড়ি থাকলে লেখাপড়া তো হবেই না। কান পেতে মা-কাকিমার কন্যাবিরহের কান্না শুনতে শুনতে মনটা আরও খারাপ হবে, তাছাড়া এ বাড়িতে ইষ্টি-কুটুমের অভাব নেই। তাই লেখাপড়ার সুবিধার্থে দু'বন্ধু ঢাকা চলে গেল। তাতে বাড়িটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল। মায়েদের কান্নাকাটি করতে আরও সুবিধা হলো। সামনে ওদের অনার্স পরীক্ষা, তাই খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। পরীক্ষার পরেই জাতীয় নির্বাচন। অমরের তো আরও সময় কম। অমর মহাচিন্তায় পড়ে গেল। সমরকে বলল, 'সমর আমাদের তো পরীক্ষার প্রস্তুতি ভাল হয়নি। চল এবার আমরা পরীক্ষা না দিলাম। ভাল করে প্রস্তুতি নিয়ে আমরা আগামী বছর পরীক্ষা দেই।' সমর একটু রেগেই বলল,

- না-না আমি ফেল করব তাও ভাল, তবুও জ্যাঠাবাবুকে ফাঁকি দিতে মিথ্যে কথা বলতে পারব না। তোর যা খুশি তুই তাই কর।

– আমি আর কি করব, তুই যেটা করবি আমাকেও সেটা করতে হবে। তুই পরীক্ষা দিবি আর আমি অন্য অজুহাতে পরীক্ষা দিব না। তাতে আমারই ক্ষতি। রাজনীতি করার জন্য বাবার কাছে এমনিতেই আমি দোষী হয়ে রয়েছি। উপরন্তু তোকে ছাড়া যদি আমি পরীক্ষা না দেই তাহলে যে কি হবে? যাক, পরীক্ষা দিবো।

দু'বন্ধুতে মনস্থির করে ঢাকা গিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়তে লাগল, কিন্তু অমরতো পড়াশোনা করতেই পারছে না। কারণ তার মাথায় যে রাজনীতির বীজ ঢুকেছে, সেখান থেকে বের হয়ে আসা খুবই মুশকিল। দোটানার মধ্যে পড়াশোনায় কিছুতেই অমর মনোযোগ দিতে পারছে না। লেখাপড়া ও রাজনীতি দুটোই করতে হবে। নির্বাচনেও পাশ করতে হবে এবং অনার্সেও পাস করতে হবে।

পরীক্ষার আগেই অমরেশকে সরকার গ্রেফতার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢুকিয়ে দিলো, দেখা করার অনুমতি নেই, তবুও সমরেশ অনুমতি বের করে অমরের সঙ্গে দেখা করল। কারণ জ্যাঠাবাবু অসুস্থ। ছেলের এহেন অবস্থার জন্য দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাঁকে সুস্থ করার জন্য সমর সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। অমরকে বকছে আর কাঁদছে সমর। বলছে, 'তুই কি জ্যাঠাবাবুকে মেরে ফেলতে চাস, উনার এমন অবস্থাতে তুই যদি জেলে থাকিস। তাহলে উনি কি কখনও ভাল থাকতে পারেন?'

অমর বলল, 'তাহলে বল তুই আমাকে কি করতে বলিস? '

– তুই রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে আয় এবং পরীক্ষার সময় এসে পরীক্ষা দিয়ে যাবি।

– তাই কি কখনো হয়, বড় বড় রাজনীতিবিদ কত নির্যাতন ভোগ করেছে তাই বলে কি তারা রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিল? বোকার মত কথা বলিস না।

– থাক তোকে আমি বোঝাতে পারব না, যা করিস না করিস, এই যে বই ও নোট খাতা দিয়ে গেলাম। মনোযোগ দিয়ে পড়িস এবং আমার আন্তরিক অনুরোধ পরীক্ষাটা দিস। এ কথা বলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সমর জেল গেট থেকে এক নিশ্বাসে বের হয়ে গেল।

অমরের জন্য জ্যাঠা-বড়মা চিন্তা করতো বলে সমরেরও ঠিকমত লেখাপড়া হচ্ছে না। সমর জ্যাঠা বাবুকে যতখানি শ্রদ্ধা করে এমন শ্রদ্ধা কোন সন্তান তার পিতা-মাতাকেও করে না। সমরের ধারণা জ্যাঠাবাবু না থাকলে সমরের জীবনের কোন মূল্যই থাকত না এবং যতটুকু যা সে করতে পেরেছে তা শুধু জ্যাঠা বাবুর বদৌলতে।

দু' তিন দিন পর পর জেলখানায় যেয়ে বইপত্র অমরকে দিয়ে আসে। সমর চায় না অমরের লেখাপড়ায় সামান্যতম ক্ষতি হোক। যখন জ্যাঠা ও বড়মার জন্য ভাল লাগে না, তখন আবার উনাদের সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে যায়। উনারাও সমরকে পেয়ে খুব খুশি হয়, বুকের মধ্যে সমরকে জড়িয়ে ধরে বলে, বাবা তুই আছিস, তাই তোকে জড়িয়ে আমরা দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করে বেঁচে আছি। অমরকে তুই যে নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসিস আমরা তা বুঝি। আজীবন তুই ওকে ভালবেসে আপন ভাইয়ের মত কাছে টেনে রাখিস। যতীন বাবুর এত স্নেহ এত আদর পেয়ে সমর ভুলেই গিয়েছে তার পিতৃ স্নেহের কথা। জন্মের আগেই তার পিতা মারা গিয়েছে। দুঃখী ছেলে সমরের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট যতীনবাবুর আদর যত্নে সব ম্লান হয়ে গিয়েছে। এমন মহোদাশয় মানুষের ঋণ কিছুতেই ভোলার নয়। দু'তিন দিন টাঙ্গাইল থেকে সমর আবার ঢাকায় ফিরে গেল।

ঢাকায় গিয়ে আবার অমরের দেখাশোনা ও তার লেখাপড়া সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতে লাগল। সমরের প্রাণের বন্ধু মনের বন্ধু অমর। অমরকে না খাইয়ে যেমন কিছু খাবে না তেমনি কোন কথাও গোপন রাখবে না। মন খুলে, প্রাণ খুলে অমরের সঙ্গে আলাপ না করলেও তার দিন কাটত না। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ছেড়ে সমরের কিছুতেই দিন কাটতে চায় না। তাই সে মনে মনে ভাবে দুজনেই যদি আন্দোলনে একসঙ্গে নামতো তা হলে দুজনেই একত্রে কারাগারে থাকতে পারত। এমনভাবে বন্ধুর জন্য দুশ্চিন্তায় থাকতে হতো না, একজন ভিতরে আর একজন বাইরে থাকবে। দুইজনেই নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে কষ্টে দিন কাটাবে। তাতে কিছুতেই শান্তি ফিরে আসবে না।

সমরেশ ও অমরেশ দুজনেই ফাইনালে ভাল পরীক্ষা দিয়েছে। সমরেশ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসেছে। এটা ভেবে যে জ্যাঠাবাবু আর বড়মার কাছে থাকলে উনারা সমরেশের সংস্পর্শে এসে কিছুটা শান্তি পাবে ও ভাল থাকবে। আবার নিজের মনে দুঃখও পাচ্ছে। ঢাকায় থাকলে তাও তো অনুমতি নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পারতাম। তাতে অমরও শান্তি পেত। সমরেশের এতটা দুঃখ হতো না। পরীক্ষার পর ছাত্ররা খুব তোড়জোড় করে আন্দোলন শুরু করলো। আন্দোলন এতই তীব্র যে বন্দীদের জামিন না দিয়ে আর কোন উপায় ছিল না। টাঙ্গাইলের মত এত ছোট একটি শহরে সকালে দুপুরে আবার বিকেলে মিছিল হচ্ছে মিটিং হচ্ছে। একবার ছাত্রদের মিছিল, আবার জনতা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিছিল চলতেই থাকছে। জয়বাংলা স্লোগানে চারিদিকে মুখরিত হয়ে উঠেছে। যেখানেই যাবে সেখানেই রাজনীতির আলাপ আলোচনা।

বিশেষ করে নির্বাচনের কথা নিয়েই বেশি আলোচনা, হাটে বাজারে বিশেষ করে নির্বাচনের আলোচনা হচ্ছে। বিভিন্ন দল থেকে রাজনৈতিক প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা চলছেই। আন্দোলনের মুখে অমর জামিনে মুক্তি পেয়ে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলের বাড়িতে চলে এলো। সঙ্গে সমরেশ ছিল। বাড়ির সবাই ওদের দুজনকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মা-কাকিমা এসে ছেলে দু'টোকে ধরে- ঘরে নিয়ে গেল। এত দিনের কষ্টের যেন কিছুটা লাঘব হলো এমনভাব বাড়ির সবার চোখে মুখে ফুটে উঠল। অমরকে ভাল করে সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে নতুন জামা কাপড় পরিয়ে খাবার ঘরে খেতে নিয়ে গেল। এরই মধ্যে পাড়া প্রতিবেশীরাও শুভেচ্ছা-স্বাগতম জানাতে ছুটে এসেছে। সমর আগতদের বিনীতভাবে বসতে বলল এবং অমর খেয়ে এসে উনাদের সঙ্গে দেখা করবে বলে জানাল।

বড়মা অনেকদিন পর ছেলে দুটোকে এক সঙ্গে খেতে দিচ্ছে আর চোখের জল মুছছে। সমর আঙ্গুল দিয়ে দেখাল বড়মাকে আর বলল, খাওয়া দাওয়ার

পর লম্বা একটা ঘুম দিবি এবং বিকেলে উঠে চা খেয়ে আমার সঙ্গে পার্টি অফিসে যাবি। অমর বলে উঠল– তোর সঙ্গে কেন? তুই কি পার্টির কেউ হোস?

– হইবা নাই হই, তোর সাথী হয়ে তো যেতে পারি।

– কীসের সাথী, রাজনৈতিক সাথী? সেটা হতে হলেও যোগ্যতা চাই।

– আরে বাবা অমরের সঙ্গে সমর যাবে তাতে আবার যোগ্যতা। শোন আমাকে সাথে না নিলে বড়মা যাবে, সেটা কি ভাল হবে? বল।

– না তা হবে না, তবে যখন হবে তখন দেখা যাবে।

সমর অমরের মাথায় হাত দিয়ে বিলিকেটে দিতে দিতে বলছিল, এখন খুব শান্তিতে ঘুম হবে। আরাম লাগছে তো?

অমর যতখানি চিন্তা করেছিল, তার চেয়ে অনার্সের ফল আরও ভাল হয়েছে। অমরতো অবাক, এত কম পড়ে এত ভাল ফল কি করে হলো! সমর এসে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাল এবং দুজনেই দুজনকে আদর করে বলল, 'এত খুশি আমি আগে কোন দিনই হইনি।' যতীনবাবু বলল, 'এমন দুঃখের দিনে তোমরা দু'বন্ধুতে আমাকে যে আনন্দ এনে দিলে জীবনেও আমি ভুলতে পারবো না। আর সমরকে যে কীভাবে ধন্যবাদ জানাবো। তাও সঠিক বুঝতে পারছি না। ছেলেটা সর্বদা ছায়ার মত আমার সঙ্গে থেকে আমাকে কখনও সন্তানের অভাব বুঝতে দেয়নি যেন আমাকে এমনভাবে আগলে রেখেছে। মনে হচ্ছিল আমিই যেন ওর একটা অবুঝ ছেলে, তাকে আদর যত্নে দুঃখ বেদনা দূর করে রেখেছে।

৭ম অধ্যায়

উকিলবাবুর বাড়ি সর্বদাই রাজনৈতিক লোকে লোকারণ্য। আগে উকিল বাবু রাজনৈতিক লোকের সমাবেশ দেখে বেশ একটু বিরক্ত হতো। কিন্তু বর্তমানে পুত্রের রাজনীতির জন্য বাড়িতে লোকে ভর্তি থাকে এবং সারা বাড়ি গমগম শব্দ হতে থাকে। দেখতে দেখতে তার অনেকটা গা সহ্য হয়ে উঠেছে। এখন উকিলবাবুর মনমানসিকতারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যারা উনার বাসায় আসে তাদের সঙ্গে উকিলবাবু আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলে, জানতে চায় বর্তমান অবস্থা কেমন এবং কোন নেতা কি রকম কোন অবস্থানে আছে। নিজেই ইচ্ছে করে এ সমস্ত ব্যাপারে খোঁজ নেয়। গ্রাম থেকে যে মক্কেলরা আসে তাদের কাছ থেকেও রাজনৈতিক ও নির্বাচনের খোঁজখবর নেয়।

নির্বাচনী প্রচারণা এমন তুঙ্গে উঠেছে যে সমস্ত শহরে কানপাতা যায় না। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত শহরের অলিগলি। প্রচারণা মিছিল, সো

ডাউন, বিভিন্ন কবিতা গান বাজনার তালে তালে মাইক দিয়ে চলছে প্রচারণা। রাস্তায় হাঁটাও দুরূহ। যে সমস্ত অভিভাবক আজ পর্যন্তও আওয়ামীলীগে ভোট দেয়নি। তাদের সন্তানেরা বাবা-মাকে বাধ্য করিয়েছে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসও এ নির্বাচনে প্রবল হয়ে ফুটে উঠেছে। তরুণদের শ্লোগান একটাই সত্যি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নৌকারও জয় জয়কার হয়েছিল, আর জয়জয়কারের সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিল আরও এক প্রাণ মাতানো শ্লোগান- জয় বাংলা। আর এই জয়ের সঙ্গে এসেছে বাংলাদেশের সত্যিকারের জয়, গর্বের জয়, আনন্দের জয়।

এই দেশের মানুষ সবাই ৬ দফার পক্ষে রায় দিল। ১৬২ টি আসনের মধ্যে শেখ মুজিবের দল আওয়ামীলীগ পেল ১৬০ টি আসন। নির্বাচনের এমন ফল নিয়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানে হৈচৈ পড়ে গেল। দুটি মাত্র আসন বাদে সব কয়টি আসনে জয় লাভ করেছে আওয়ামীলীগ। পশ্চিম পাকিস্তানে ৪টি প্রদেশের মধ্যে দুটি প্রদেশে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপল্স পার্টি বেশি আসন পেয়েছে। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ মিলে ভুট্টোর পার্টির ৮৩ টি আসন পেয়েছে।

পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামীলীগই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে পরিগণিত হলো। কিন্তু তা হলে কি হবে। আবার নতুন করে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। স্বৈরশাসক কীভাবে বাঙালিদের ক্ষমতায় যেতে দিতে না হয় ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে সঙ্গে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতেই লাগল। শেষ পর্যন্ত যখন কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেও তারা দিনের পর দিন কথা না বলে গোপনে সৈন্য ও গোলাবারুদ এনে পূর্ব পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টে রেখে দিল।

নানা কথা নানা টালবাহনা করে একদিন ইয়াহিয়া ঢাকায় এসেও অধিবেশন না বসিয়ে কিংবা ক্ষমতা হস্তান্তর না করেই পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেল।

এরপরই বঙ্গবন্ধু অসহযোগের ডাক দিল। ২ মার্চ শেখ মুজিব বলল, বাঙালিরা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হতে চায়– এই কথার ভিত্তিতেই ৩রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের এক অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

একটি পতাকাও তৈরি করা হলো, সারাদেশে লাগাতার হরতাল মিছিল, সভা চলতেই লাগল। গাড়ির চাকা ঘুরল না, কোর্ট কাচারী অফিস-আদালত দোকানপাট সব কিছু বন্ধ। পাকিস্তানি বাহিনী নেমে পড়ল। কারফিউ জারী করল। এমনি করেই এসে গেল ৭ই মার্চ। ১৯৭১ সাল, রেসকোর্স ময়দানে সকল বাঙালিকে বঙ্গবন্ধু ডাকলেন এখানে। লক্ষ লক্ষ বাঙালির সামনে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করল, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।'

রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি ৬ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা এই সময় অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুললো।

পূর্ব পাকিস্তানের কবি-সাহিত্যিক, ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক- বুদ্ধিজীবী, অফিসের কর্মচারী, মেহনতী মানুষ রিক্সাওআলা আপামর জন সাধারণ সবাই তখন রাস্তায় নেমে পড়েছে। এখন আর ৬ দফা নয়, এখন শুধু এক দফা- স্বাধীনতা চাই- স্বাধীনতা।

২৫ শে মার্চ কালরাত। ভয়ঙ্কর দুর্বিষহ রাত। পাকসেনা বাহিনী প্রথমে হামলা চালাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে। সে রাতে অনেক শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী মারা গিয়েছে। জহিরুল হক হল, জগন্নাথ হলের ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। রাজারবাগ পুলিশ সদর, পিলখানা ইপিআর সদরে পাকমিলিটারিরা বাঙালি পুলিশ ও ইপিআরকে একেবারে ধূলোয় মিশিয়ে দিল।

২৫ শে মার্চ রাত ১২ টার পরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে টি.এন্ড.টির টেলেক্স যোগে বার্তা পাঠালেন। ইপিআর ওয়ারলেসে তা প্রচারিত হলো। এর পরেই রাতের অন্ধকারে সব-ঘটনা ঘটানোর সঙ্গে সবার আগে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে করাচীতে নিয়ে গেল পাকিস্তানিরা। ২৫ শে মার্চের পর অনেক বাঙালি নেতা-কর্মীরাই ছিল বিভ্রান্ত। কি হবে, কীভাবে কি করবে। তখন তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। উপয়ান্তর না দেখে তারা নানাখানে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। এর মধ্যেই ২৬ শে মার্চ ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করে বেলা ১ টায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র উদ্বোধনের প্রথম ঘোষণা প্রচার করা হয়। ঐ বেতারের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাংলার মানুষ জানতে পারল বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এরপর থেকে তরুণ, উৎসাহী জনতা, ছাত্র সবাই আর চুপ করে বসে রইল না। ওরা তো ঠিকানা পেয়েছে। ঐ ঠিকানাতেই তাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। দলে দলে ছাত্র জনতা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে লাগল। ঘরের দরজা বন্ধ করে মুক্তিপাগল মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শুনে। দেশের মানুষ সবাই মুক্তিযোদ্ধা হলো।

এতদিন পর অমরেশ যেন একটা কাজের সুযোগ পেল। বাড়ির কাউকে কিছু না বলে দুই বন্ধু পরামর্শ করে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দিল। আর দুজনে ঠিক করলো, কোন অবস্থাতেই তারা বাড়ি যাবে না এবং মা-বাবার কোন খোঁজ খবরও নিবে না, কারণ তাহলে মা-বাবার আকুতি মিনতি ভরা কান্নাকাটিতে ওরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ওদের পিছুটান বাড়বে। তাই ওরা স্থির করেছে। এখন শুধু দেশ মাতৃকাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে যাবে। এত মনোযোগ দিয়ে কাজ করাতে ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করাতে ওদের কমান্ডার দুজনকেই ভীষণ

ভাবে ভালবাসে এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাজে ওদের কাছ থেকে শলাপরামর্শ নিয়ে থাকে। বাঙালিরা দেখিয়েছে যুগে যুগে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য বারবার অস্ত্র হাতে সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছে। তারা ভীরু নয় বরং বীর যোদ্ধা জাতি এই বাঙালি। তাদের প্রচুর পরিমাণে তেজ ও অস্ত্রচালনা শক্তি আছে।

যখন পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো, তখন নির্মমভাবে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালিদের মেরে ফেলছিল। তখন পৃথিবীর মানুষ বাঙালির পক্ষ নিল এবং পাকিস্তানিদের নিন্দা করতে লাগল। প্রাণের ভয়ে এককোটি বাঙালি দেশ ছেড়ে নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিল। ভারত শরণার্থীদের থাকতে দিল, খেতে দিল এবং অস্ত্র দিয়ে অস্ত্র চালনা শিক্ষাও দিল এই বাঙালিদের। তারপর ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করে। অনেক ভারতীয় সৈন্যও নিহত হয়েছিল।

এইভাবে এদেশের সাহসী ছেলেরা নয়মাস নিরলসভাবে যুদ্ধ করে এগিয়ে গিয়েছে। যুদ্ধ করতে করতে একদিন তারা উদ্ধার করল স্বপ্নের মাতৃভূমির স্বাধীনতা। অমরের মা-বাবাও নানাখানে পালিয়ে আত্মগোপন করে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহে গ্রামের বাড়িতে উঠেছে। উঠলে কি হবে সারা দিনরাত কান্নাকাটি আর ওদের থামে না। সরলা কাঁদে আর বলে, 'আমার ধনেরা আর বেঁচে নেই। ওরা যদি বেঁচে থাকত, তাহলে একবার অন্তত আসত, না আসলেও কারও মারফত একটা খবর তো দিত।' সরলার সঙ্গে সঙ্গে আরতিও চিৎকার করে কেঁদে উঠল ছেলের জন্য। এদিকে রাজাকার আর আলবদর বাহিনীর অত্যাচার আরও বেড়ে গেছে। যখন তখন বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েই বলবে, ছেলেরা কই, মুক্তি হয়েছে তো। তাড়াতাড়ি তাদের আসতে বলেন, নইলে বিপদ হবে কিন্তু। আড়ালে মুখ লুকিয়ে চোখের জল গোপন করে উকিলবাবু চুপ করে থাকে। রাজাকার আবার বলে – চুপ করে আছেন কেন? ভীষণ বিপদে পড়বেন।

উকিলবাবু তবুও কিছু বলতে পারে না। পারে না ধমক দিতে, পারে না রাজাকারের কাছে মাফ চাইতে। এ কেমন জ্বালায় পড়ল সে, এর চেয়ে যে মরণও ভাল। সরলা এগিয়ে এসে রাজাকারকে বলল, 'উনাকে আর কষ্ট দিও না, উনি সত্যিই জানে না ছেলেরা কোথায়? বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও আমরা বলতে পারবো না।' এ কথা শুনে আরতি আর্তচিৎকার দিয়ে বলল, 'দিদি এমন কথা বলো না আমার বুক ফেটে যায়।' ওদের কান্না দেখে রাজাকাররা চলে গেল। একটা চেয়ারে বসে উকিলবাবু কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'যে উকিল বাবুকে গ্রামের লোক এত সম্মান করত, সমীহ করত আর আজ তাকেই কেমন অপমানজনক কথাবার্তা বলছে। লোকের অপমান সহ্য

করবো তবুও যেন আমার সোনার চাঁদ ছেলেরা বেঁচে থাকে। আমি যেন ওদের চাঁদ মুখ আবার দেখতে পাই। ভগবান, একমাত্র তুমিই ভরসা।' সরলা ও আরতি উকিল বাবুকে কান্না থামাতে সান্ত্বনা দিতে লাগল। সরলা বলল, 'দেখো আমাদের সোনাদের কিছু হবে না। দেখো ওরা হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে আসবে।' আরতি বলল, 'তাই যেন হয় দিদি, তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, আমরা যেন আমাদের ছেলেদের মুখে মা ডাক শুনতে পারি' বলেই তিনজনে মিলে কাঁদতে লাগল।

একদিন গ্রামের লোকেরা দেখতে পেল আকাশে উড়োজাহাজ উড়ছে এবং জাহাজ থেকে ছত্রী সেনা নামছে। গ্রামের লোকদের জানার কথা নয় কি নামছে তাই তারা ভয় পেয়ে গেছে। আর যারা পাকিস্তানপন্থি তারা বলাবলি করতে লাগল, এখন বুঝবে মুক্তিবাহিনী, পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করার সাধ হাড়ে হাড়ে টের পাবে। চীন থেকে সৈন্য নামছে, এবার কি হবে দেখবো মজা। ওরা ছত্রী সৈন্য নয় আসলে ছিল ভারতীয় সৈন্য। ওরা টাঙ্গাইলের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ঘারিন্দা, বামনকুশিয়া, বার্তা, ভুক্তা, সুরুজ এই সমস্ত গ্রামে প্যারাসুট দিয়ে নেমেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে চলে গেল। দিনটি ছিল ১১ই ডিসেম্বর। জয়বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে গ্রামের ছেলেরা উকিল বাবুর বাড়ির দিকেই আসছে, তাই ওদের গলার আওয়াজ শুনে মনের দুঃখে দুই মা ঘরের ভিতরে ঢুকে সঙ্গোপনে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ করে দুইমা-ই কান খাড়া করল। কি বলছে ওরা, জয় অমরেশের জয়, জয় সমরেশের জয়, মাগো, খোল খোল দ্বার, সমর, অমর এসেছে ফিরিয়া, জয় বাংলা। দুই মা পড়ি কি মরি করে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। বাবা, বাবা, আয় বাবা মায়ের কোলে আয় বলে দু'জনে সাপটে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আবার কাঁদতে লাগল। এবার কিন্তু অমর-সমর দুজনেই মায়েদের সঙ্গে কান্না শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উকিলবাবু হৈচৈ শুনে বাইরে এসে আনন্দঘন দৃশ্য দেখে দুই ছেলেকে একত্র করে আদর করতে লাগল। উকিলবাবু আনন্দাশ্রু বিসর্জন দিতে দিতে বলল, যাক বাবা তোমরা ধন্য, ধন্য তোমাদের পরিশ্রম, আশা-আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়েছে বলেই জয় বাংলা ধ্বনি দিলেন। তখন উঠানের সব মুক্তিযোদ্ধা ও সমর্থকদের জয়বাংলা ধ্বনিতে উকিল বাবুর বাড়ি মুখরিত হয়ে উঠল।

সরলা ও আরতি দু'মা-ই নিজেদের ছেলেকে ওখান থেকে নিয়ে যেতে অন্যদের কাছে অনুমতি চাইল এবং ওদের পরে আসতে বলল। কত দিনের দুঃখ কষ্ট আজ কিছুটা প্রশমিত হয়ে আনন্দ লাগছে। ওদের বাথরুমে পাঠিয়ে মায়েরা রান্না ঘরে ঢুকল ছেলেদের পছন্দমত রান্না করে খাওয়াবে বলে।

৮ম অধ্যায়

১১ই ডিসেম্বর বাড়িতে কেউই বসে থাকতে পারল না। কারণ গ্রামের লোক ও শহরের লোকেরা একের পর এক আসতেই লাগল। এদের সাক্ষাৎকার দিতে দিতে দু'জনে খুব মজা পাচ্ছিল।

এমনটি যে হবে ওরা তা ভাবতেই পারেনি। শীতের রাত্রি একের পর উনুনে চা হচ্ছে তো হচ্ছে, লোকেরাও শীতে গরম চা খেয়ে মজা পাচ্ছে। এমন এক বাড়িতে এসে খাচ্ছে। যে খাওয়ায় সে যেমন আন্তরিকতার সাথে খাওয়ায় আর যারা খায় তারাও খেয়ে খুব আনন্দ পায়। সব বাড়ির সঙ্গে উকিলবাবুর বাড়ির তুলনা হয় না। টাঙ্গাইল যেতে যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব এসেছে তারা রাতে থাকবে। তাছাড়া অন্য আত্মীয়-স্বজনরাও রাতে থেকে যাবে। সেজন্য রাতে মহাভোজের আয়োজন করা হয়েছে। এ বাড়িতে যেন উৎসব-উৎসব ভাব মনে হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে ছেলেরা উঠানে চেয়ার টেবিল পেতে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করল। খাওয়ার পর ঘর বারান্দা উঠোন পরিষ্কার করা হলো। যারা এ বাড়িতে থেকে গেলো তাদের জন্য রাতে শোবার ব্যবস্থা করা হলো। এ সমস্ত ঝামেলা চুকে যাওয়ার পর দু'বন্ধুকে নিয়ে উকিল বাবু যেখানে কলেজ বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে সেখানে গেলো। অনেকখানি তৈরি হয়েছে। এখন তোড়জোড় করে কাজ করলে ঠিকই হয়ে যাবে। বাকি রইলো আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র। সম্পদের মধ্যে আছে, সেটাতো মাটি। মাটিতো চুরি করা সম্ভব নয়। সময় এলে জমি বিক্রি করে, তারপর সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। সমরকে জ্যাঠাবাবু আগে থেকেই জানিয়ে রাখল, 'তোমাকে আমি আমার কলেজের প্রিন্সিপাল করতে চাই। তুমি এ বিষয়ে প্রস্তুত থেকো। আর অন্যান্য প্রফেসর ও কর্মচারীর ব্যবস্থা করতে হবে।'

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সব কিছু ঠিক হতে যথেষ্ট সময় লাগবে। সমর ও অমরের এমএ ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ এখনও পড়েনি। তবে তাড়াতাড়িই পড়বে। সেজন্য ওদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে এবং ভাল ফল করতে হবে। তাই দুজনেই লেখাপড়া করতে ঢাকা চলে গেল। উকিল বাবুর মনটা খুব ফুরফুরে। ছেলেরা সুস্থ সবলভাবে যুদ্ধ করে বাড়ি ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় মনোসংযোগ করে ভাল রেজাল্ট করবে। এই ভেবে উকিলবাবুর মন খুবই ভাল লাগছে।

দুজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে উকিলবাবু নিজেও নিজের কোর্টের কাজে মনোনিবেশ করল। এতদিন তো প্রাণের ভয়ে এ গ্রাম ছেড়ে ও গ্রামে, হেথা থেকে অন্যকোথাও শুধু দৌড়ই পেরেছে রোজগার পাতি কিছুই তো আর হয়নি। নিজেদের খরচ ছেলেদের লেখাপড়া, বই, খাতাপত্র এসবের খরচ জোগাতে হবে। তাই আবার মনোযোগ দিয়ে কোর্টের কাজ করতে হবে। এবার

সংসারটা সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়ে মনের সুখে নতুন করে সংসার করবে এটাই যতীন বাবুর আকাঙ্ক্ষা। এতদিন তো উৎকণ্ঠা ও দৌড়াদৌড়ির মধ্যে কেটে গেল। এবার স্থিতিশীল হয়ে সংসারের হাল ধরে চলতে হবে।

দুইবন্ধু আগের মতই যথেষ্ঠ মনোযোগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করল। যাদের টাকা পয়সার জন্য চিন্তা করতে হয় না তাদের কোন টেনশনও থাকে না। ওদের চিন্তা মা-বাবাকে সুখে রাখা ও ভাল রেজাল্ট করা। অমর যে সপ্তাহে বাড়ি যায় সমর সে সপ্তাহে হলে থাকে। দুজনে অদলবদল করে বাড়ি যায়। কারণ স্বাধীনতার পর বাসে যাতায়াত খুবই কষ্টকর। রাস্তা বিভিন্নস্থানে ডাইভারশন থাকাতে ২ ঘন্টার জায়গায় ৫ ঘন্টা সময় লাগে। তাতে শারীরিক অসুস্থতারও কারণ হয়। তাই ওরা দুজনে একসঙ্গে অসুস্থ হতে চায় না। কিছুদিন যাবৎ আরতির শরীরটা বেশি ভাল যাচ্ছে না। যতীনবাবু ওর চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেনি। চিকিৎসা ঠিকমতই চলছে। ডাক্তার বলেছে অত্যধিক টেনশনের জন্য শরীরের এমন অবস্থা। পরিবেশ পরিস্থিতি এখন তো ভাল, কাজেই আশা করা যায় তাড়াতাড়ি আরতি সুস্থ হয়ে উঠবে। সমর মায়ের জন্য ভীষণ উদ্বিগ্ন। ওর তো আপন বলতে আর কেউ নেই, শুধু এক মা-ই সম্বল। এত ভদ্র, সভ্য, লক্ষ্মীমা সংসারে খুব কমই দেখা যায়। তাই সমর সর্বদাই মায়ের জন্য ভীষণ চিন্তায় থাকে। এর মধ্যে সমর অসুস্থ হয়ে টাঙ্গাইল মায়ের কাছে ছুটে এসেছে। যতীনবাবু মা-ছেলেকে নিয়ে আবার ভীষণ চিন্তায় পড়ল। একজনের টেনশন কেটে গিয়ে কিছুটা ভালর দিকে আর একজন নতুন করে টেনশনে পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সংসারের কর্তারইতো সব জ্বালা, তাকেই সবকিছু মানিয়ে নিতে হয়। কর্তব্যে এতটুকু ত্রুটিও উকিলবাবু করেনি।

সমর হলে যাওয়ার পূর্বেই অমর বাড়িতে চলে এল। কারণ সমরকে ছেড়ে অমর হলে থাকতে পারছে না। – চল সমর তোকে ছাড়া থাকতে পারছি না, তুই ছাড়া লেখাপড়ায়ও মনোযোগ দিতে পারছি না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এখন পড়াচ্ছে। সারাজীবন আলোচনা করে পড়েছি, তাই একা একা পড়তে ভাল লাগছে না। দুজনে একসঙ্গে থাকলে ভাল লাগবে, অসুখও ভাল হয়ে যাবে। চল সমর। বন্ধুর অনুরোধ ফেলতে না পেরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সমরের মাও এসে বলল, 'তোরা এখনই চলে যাবি? সমর বলল, না গো মা, আজ রাত তোমাদের কাছে থাকবো। কাল ভোরে আমরা রওনা হবো।'

– আচ্ছা, তাই হবে।

পরের দিন দুই বন্ধু মিলে ঢাকার দিকে রওনা হলো।

অমরতো রাজনীতি কোনদিনও ছাড়তে পারবে না, একবার যে নেশায় পড়েছে তা কি সহজে ছাড়া যায়। আর সমর বাড়িতে থাকলে ক্লাসনোট তো অমর নিতে পারবে না। সেতো রাজনীতিতে মগ্ন। তাই সমরের দরকার। সমর

ক্লাস নোট সব গুছিয়ে রেডি করার পর অমর এসে চোখ বুলাবে। তাতে অমরের সুবিধা হবে, রাজনীতিও করা হবে, পড়াশুনাও চালিয়ে যেতে পারবে। সেটা আবার সমর সহজেই বুঝতে পারে। যাক, বন্ধুর জন্য এতটুকুন করতে পেরেই সমর খুশি। মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে সমর রাজনীতির ধার কাছ দিয়ে ঘেঁষেনি।

অনিমার শ্বশুরবাড়ি রাজশাহীতে বিশেষভাবে অনুরোধ করে অনিমার শ্বশুর-শাশুড়ি দুজনেই চিঠি দিয়েছে ওদের ওখানে যাওয়ার জন্য। বিয়ের পর সরলা ও আরতি, সমর ও অমর ওরা কেউই ওখানে যায়নি। তাই উকিলবাবু ভাবছে নানা ঝামেলা, যুদ্ধ নানা কিছুর জন্য জামাইবাড়ি কর্তব্যটুকুও পালন করা হয়নি। এবার সবাইকে নিয়ে যাবো এবং আমোদ আহ্লাদ করে আসবো। অমর-সমর দুইজনেই যাবে বলে মত দিল। কারণ তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে কোন অসুবিধা হবে না। মেয়ের বাড়ি এই প্রথম যাচ্ছে দুই শাশুড়ি– কি নিবে, কি খেতে ভালবাসে মেয়েটা, জুতা থেকে আরম্ভ করে চুলের ক্লিপ পর্যন্ত গুছিয়ে নিল। দুই দাদা এসে বলল, 'আমরা কি নিবো বোনের জন্য?' সরলা বলল, 'তোদের যা মন চায় তাই নিবি, দাদা হিসেবে তো নিতেই হবে।' যতীনবাবু বললেন, 'রাস্তাঘাটের যে অবস্থা তাতে বেশি কিছু নেওয়া যাবে না। দেখ আবার হেঁটে যেতে হয় নাকি?' সমর বলল, 'সেটাও ঠিক যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা হতেই পারে।' কিন্তু দুই মা নাছোড়বান্দা। তারা মেয়ের জন্য যা যা গুছিয়েছে, সবই নিবে। তারা খালি হাতে যাবে না। দুই বন্ধু বলে উঠল, 'হেঁটে যেতে হলে আমরা দু'জনে দুমাকে কোলে করে নিয়ে যাবো। তবুও মাদের সাধ আহ্লাদ পূরণ করব।' যতীনবাবু বলল, 'ওদের নিবি আর বাবাকে কি করবি।' সমর বলল, 'কি আর করে? বাবাকে মাথায় করে নিয়ে যাবো। হবে তো? জ্যাঠাবাবু তুমি রাজীতো? তবে চল।'

নির্দিষ্ট দিনে সবাইকে নিয়ে ওরা রাজশাহীতে এসে পৌঁছাল। বাড়ির গেটের সামনে গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে অনিমারা সবাই বাবা মাকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল। অনিমা যখন দাদাদের প্রণাম করার জন্য এগিয়ে এলো, তখন অমর অনিমাকে কানমলা দিয়ে বলল, 'এ কি করেছিস বোন? এটা কি ঠিক করেছিস? আমরা যখন দেশের দুর্দিনে দেশরক্ষার্থে যুদ্ধে নেমেছি। আর তুই তখন এমন অপকর্ম করে বসে আছিস?' সমর বলে উঠল, 'ঠিক করেছে। যেখানে বাংলার ত্রিশ লাখ সন্তানকে প্রাণ দিতে হয়েছে। সেখানে আমার বোন ঠিকই করেছে। ক্ষতি পূরণ করেছে। বোন শুধু কি উৎপাদনই করেছে? লেখাপড়া করেছ কি?'

– হ্যাঁ দাদা, তোমাদের জামাই যেখানে আমাদের নিয়ে পালিয়েছে সেখানেই বই-এর বস্তা বোগলদাবা করে নিয়ে গিয়েছে। বলেছে যা কর আর নাই কর লেখাপড়া তোমাকে করতেই হবে এবং ভাল রেজাল্ট করতেই হবে। আর উপায়

কি? অমর বলল, 'হ্যাঁরে বোন তুই এত পাকামো কথা শিখলি কোত্থেকে? আমার ছোট লাজুক বোন তো এমন করে কোনদিনও কথা বলেনি।'

– তোমরা যার হাতে দিয়েছ তার কাছে জিজ্ঞেস কর।

– আমি বুঝেছি, ঐ ছোকরাই সব শিখিয়েছে।

জামাইতো লজ্জায় মরে আরকি।

সরলা অমরের কান ধরে বলল, 'চল এখান থেকে, তুই-ই বা এমন পাকা হলি কীভাবে? দেখতে পাচ্ছিস না, লজ্জায় ছেলেটার কেমন চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে যা-'

– ওমা তুমি এমন করছ কেন? অনিমেষ আমার কে হয় সেটাও কি ভুলে গেছ? আমি ওর সমুন্দি, বুঝেছ?

তাছাড়া বিয়ের পরতো ভাল করে আলাপই হয়নি। আর মাঝখানে দেশের যে দুর্যোগ গেল তাতে যে আমাদের পুনর্মিলন হয়েছে, এটাই তো পরম সৌভাগ্য। ওহে অনিমেষ এদিকে এসো, মন খুলে প্রাণ খুলে কথা বল। অনিমেষও কম যায় না। অমর ও সমরের সামনে এসে বলল,

– হ্যাঁ আমিও তো তাই বলি, আপনারা হলেন আমার বড় কুটুম, ফেলনা তো নয়। আসুন হাতমুখ ধুয়ে আমার ঘরে বসুন, তখন মন খুলে প্রাণ খুলে হৃদয় উজাড় করে কথা বলব ও আলাপ করব আসুন।

অনিমার শাশুড়ি বলল, তাই যাও বাবা, তোমরা বসো, আমি খাবার নিয়ে আসি। সবাই খুবই পরিশ্রান্ত, তাই আড্ডাটা রাতের জন্য রেখে দিল।

সমর বলল, 'মা তুমি আগে বলনি কেন অনিমার এ অবস্থা তাহলে তো পুচকোটার জন্য কিছু আনতাম।'

– না বাবা জন্মানোর আগে কিছু দেওয়া নিষেধ, তাই কিছুই আনা যেতো না।

– ওমা অনিটা এত সুন্দর হয়েছে কেন গো? গায়ের রং ফেটে পড়ছে। আগে তো এত সুন্দর ছিল না।

– তুই বুঝবি না, আরও একটু বড় হ, বুদ্ধিটা বাড়ুক, তাহলে বুঝতে পারবি।

সমর বলে উঠল, 'আগে বিয়ে হোক, তখন সাবালক হয়ে সব কিছু বুঝবি।'

যতীনবাবুরা এখানে এসেছে মেয়ের পঞ্চামৃত উপলক্ষে। কালই পঞ্চামৃত অনুষ্ঠান হবে। তারপরের দিন যতীনবাবুরা সাধ ভক্ষণ করিয়ে চলে যাবে। অমরের ইচ্ছা আরও কয়েকদিন থেকে যাবে কিন্তু সমরের লেখাপড়া নষ্ট করার

সময় নেই। তাই সে তাড়াতাড়ি চলে যাবে। অমর শহর ঘুরে নিজের দলের লোক খুঁজে বের করে রাজনীতির আসর প্রায় প্রতিদিনই বসায়।

এদিকে ফিরে যাওয়ার দিন ঠিক হয়ে গেছে। যতীনবাবু মেয়ে ও জামাইকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরে এল, টাঙ্গাইলের বাড়ি অনেক দিন পর গ্রামের আত্মীয়-স্বজনরা এলো। পাড়া-প্রতিবেশী এবেলা ওবেলা করে এসে বেড়িয়ে যায়। এত আনন্দ, এত কোলাহলের মধ্যে দু বন্ধুর বাড়িতে থেকে যাওয়ার উপায় নেই, কারণ সামনেই তাদের এম.এ. ফাইনাল পরীক্ষা। অনিমা এখানে এসে রাজকন্যার সম্মান পেয়ে মা ও কাকিমার আদরে আহ্লাদে টইটম্বুর হয়ে উঠেছে। মেয়ে কোনটা খেতে চায়, কোনটা খেতে ভাল লাগবে, কোন শাড়িটায় মেয়েকে মানাবে, কোন ব্লাউজে ওকে আরও উজ্জ্বল লাগবে এগুলো নিয়েই সবাই ব্যস্ত।

৯ম অধ্যায়

সমর লেখাপড়া নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত, একদিন লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ছে। পড়তে পড়তে মনে হলো খুব মিষ্টি একটা পারফিউমের গন্ধ আসছে। গন্ধটা খুঁজতে খুঁজতে চোখে পড়ল তার পাশে বসে আছে একটি সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার হাতের বইটি দেখতে পারি কি?'

– না, কেন?

– আমি তো ঐ বিভাগের ছাত্রী কি না, তাই কৌতুহলবশত দেখতে চেয়েছিলাম।

– দেখবেন, এখনও সময় হয়নি, এর আগে তো আপনাকে কোনদিন দেখিনি।

– দেখবেন কি করে, আমি সবে এসেছি মাত্র কয়েকদিন ক্লাস করেছি।

-ঠিক আছে সবই দেখবেন কিন্তু সেটা পরে দেখতে হবে।

এ কথা বলে বইখানা হাতে নিয়ে সমর অন্য একটি টেবিল ফাঁকা পেয়ে সেখানে গিয়ে বসল। মেয়েটি ভাবল এ কেমন ভদ্রলোক। সামাজিকতার বোধ জ্ঞানও নেই। নির্লজ্জের মত মেয়েটি সমরের টেবিলের সামনে গিয়ে বলল, 'আমাকে মাফ করবেন। এভাবে আপনাকে ডিস্টার্ব করা আমার উচিত হয়নি। আমার নাম সুজাতা মল্লিক, বাড়ি কিশোরগঞ্জ সদরে। আপনার পরিচয়?'

– আমি? আমার নাম সমরেশ ভট্টাচার্য, বাড়ি টাঙ্গাইল জেলা সদরে। আমার এম.এ. ফাইনাল কিনা, তাই অযথা সময় নষ্ট করতে চাই না। কিছু মনে করবেন না।

মেয়েটা কিছু না বলে নমস্কার জানিয়ে লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে গেল। সুজাতার গমন পথে সমর তাকিয়ে রইল আর ভাবল, মেয়েটা পড়ুয়া, পড়তে খুব ভালবাসে, নইলে সবে ভর্তি হয়ে ফাইনাল ইয়ারের বই খোঁজ করছে। সাধারণত এমনটা দেখা যায় না।

ঐ দিন সমরের পড়ায় আর মন বসল না। খানিকক্ষণ পরেই সে ওখান থেকে হলে চলে এলো। সমর তো বইয়ের পোকা, বই পেলে তার আর কিছু লাগে না। অত সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়ে তার পাশে ঘুরঘুর করুক না কেন, তাদের প্রতি সে এতটুকুও মনোযোগ দিবে না কিন্তু সুজাতা যেন কেমন একটা ভাব দেখিয়ে সমরের হৃদয়ে দোলা দিয়ে নীরবে চলে গেল। সেই কথাটাই সমর ভাবছে এ কেমন মেয়ে।

কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারছে না। তবুও চেষ্টা করে যাচ্ছে মন বসাতে। কারণ সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা, লেখাপড়াই সমরের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেমন করেই হোক, পরীক্ষার ফল তাকে ভাল করতেই হবে।

দুইবন্ধু ঠিক করল ফাইনাল পরীক্ষার কয়দিন আগে ওরা বাড়ি ঘুরে আসবে। গুরুজনদের পরীক্ষার আগে আশীর্বাদ নিয়ে আসবে। বিকেলের দিকে ওরা বাসস্ট্যান্ডের দিকে রওনা হলো। ওরা পৌঁছতে পৌঁছতে দেখল টাঙ্গাইলের শেষ বাসটা ছেড়ে চলে গিয়েছে। আর কি করা বাধ্য হয়ে ওরা হলের দিকে ফিরবে ভাবল। তখন বাসস্ট্যান্ডে একজন বাস কন্ডাক্টর ওদের বলল, 'ভাই আপনারা কোথায় যাবেন?' ওরা বলল, 'আমরা টাঙ্গাইল যাবো।' তখন লোকটা বলল, 'এই বাসে যেতে পারেন, এটা টাঙ্গাইল হয়ে কিশোরগঞ্জ যাবে।' এ কথা শুনে দুজনেই খুশি হয়ে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে এসে বাসে উঠল। বাস ছেড়ে দিয়েছে, ওরা বাসের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে তাকাতাকি করে দেখছে বাসে কোথাও সিট আছে কিনা। তাকাতেই সমরের সঙ্গে সুজাতার চোখাচোখি হয়ে গেল। সুজাতা সমরকে দেখে নমস্কার জানিয়ে ওর পাশের সিটটিতে বসতে বলল। সমর অস্বীকার করে বলল, 'মাফ করবেন, আমার দুটো সিট লাগবে।' সুজাতা জায়গা না দিতে পেরে একটু যেন কষ্ট পেল। কেবলই উসখুস করছিল। ঢাকা থেকে কিছুদূর আসার পর বেশ কয়েকজন নেমে যাওয়ার পর ওরা দু বন্ধু জায়গা পেল। সুজাতা বলল, 'এখনতো আমার পাশের সিটটা নিতে পারেন।' সমর বলল, 'না-না তার আর দরকার নেই, আমরা তো পাশাপাশিই বসে আছি।' অমর সমরকে চিমটি কেটে বলল, 'তুই চিনিস নাকি ভদ্র মহিলাকে? অবশ্যই তোর পূর্ব পরিচিত। তা না হলে এত আন্তরিকতার সাথে কেউ পাশে বসতে বলে।' সমর একটু লজ্জান্বিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এর আগে একদিন লাইব্রেরিতে দেখা হয়েছিল এবং কথাও হয়েছিল?' অমর বলল,

– কি? দেখা হয়েছিল এবং কথাও হয়েছিল? বেশ বেশ।

যথারীতি টাঙ্গাইল বাসস্ট্যান্ডে এসে বাসটি থামল। দু বন্ধু টাঙ্গাইল এসে পৌঁছেছে নামার উদ্যোগ নিচ্ছে এবং সুজাতাকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছে। এমন সময় বাসের হেল্পার এসে বলল, 'কিশোরগঞ্জগামী যাত্রী না থাকায় বাসটি আর যাবে না। সুজাতা লাফ দিয়ে সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাস যদি কিশোরগঞ্জ না যায় তবে আমার কি হবে?'

অমর ও সমর এসে বাস ড্রাইভারকে বলল, 'কিশোরগঞ্জগামী বাসটি যদি কিশোরগঞ্জ না যায় তবে মহিলাটির কি হবে? উনি তো টিকিট করে এসেছেন?' ড্রাইভারও ভীষণ চিন্তায় পড়ল। যাত্রীহীন গাড়ি শুধু একটি মেয়ে নিয়ে কি করে এতদূর যাবে। সেটাও ভীষণ চিন্তার কথা। মেয়েটি তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, তার মাথায় কোন বুদ্ধি আসছিল না। সমর ধমক দিয়ে অমরকে বলল, 'শুধু শুধু রাজনীতি করিস, এটা কি খুব জটিল সমস্যা? মোটেই না। আমরা দুবন্ধু মিলেই এর সমাধান করতে পারবো।' সমর বলল, 'ম্যাডাম আমার একটা প্রস্তাব আছে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে বলতে পারি।' সুজাতা নির্দ্বিধায় বলল, 'আমার কোন কিছুই মনে করার নেই, কারণ এখন আমি বিপদগ্রস্ত। বলুন আপনার প্রস্তাব।' সমর বলল, 'একি কথা, বিপদে ধৈর্য হারা না হয়ে কাজে অটল থাকাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা একান্নবর্তী পরিবার। কাজেই আমাদের বাড়ি আমার জ্যাঠাবাবু শহরের একজন স্বনামধন্য উকিল। আমার মা ও বড় মা দু'জনেই অমায়িক। আপনি যদি চান তা হলে আমাদের সাথে আমাদের বাড়িতে আসতে পারেন।' সুজাতা কালবিলম্ব না করে রাজী হয়ে বাস থেকে নেমে পড়ল। বাসস্ট্যান্ড থেকে ওরা হেঁটে বাড়ি পৌঁছাল। মা বড়মার ও জ্যাঠাবাবুর সঙ্গে সুজাতার পরিচয় করিয়ে দিলে এবং সুজাতার বিপদে ওরা সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এসেছে শুনে উকিলবাবু ভীষণ খুশি হলো। আর ছেলেদের প্রশংসা করল। মানুষের উপকার করা ও বিপদে উদ্ধার করাই প্রকৃত মানুষের কাজ।

সুজাতাকে সরলা ও আরতি নিজ কন্যার মত খুবই আদর যত্ন করল এবং তাদের কাছে শুতে দিল। পরের দিন সকালে উঠে সুজাতা চলে যেতে চাইলেও কেউ যেতে দিল না। অমর সমরের কাছে গিয়ে বলল, 'শিকার যখন নিজে এসে ধরা দিয়েছে। সমর এটাকে কিন্তু ছাড়বি না। আমি আছি তোর সাথে। তোকে সর্বাত্মক সাহায্য করবো।' সমর ধমক দিয়ে উঠল এবং বড়মাকে বলল, 'ওকে ফাজলামি করতে না করতো বড় মা। সামনে পরীক্ষা আর ওর রঙ্গরসের বাহার দেখে বাঁচি না।' অমর বলল, 'বেশ আমি চুপ করলাম কিন্তু পরে সবাই বুঝবে কি দিয়ে কি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে।'

সুজাতাকে কিশোরগঞ্জের বাসে তুলে দিয়ে ওরা দুজন ঢাকার বাসে উঠে ঢাকায় চলে গেল। পরীক্ষা অতি নিকটে তাই ওরা লেখাপড়ায় অধিকতর

মনোযোগী হয়ে উঠল। বাড়িতে জানিয়ে এসেছে পরীক্ষা শেষ করে একবারে বাড়ি ফিরে আসবে। সুজাতার ব্যবহার, কথাবার্তায় দুমায়েরই খুব ভাল লেগেছে। মেয়েটি দেখতেও যেমন সুন্দর, আচার-আচরণও তত মধুর। সুজাতার মা বেঁচে নেই। সুজাতারা দুই ভাই, একবোন। সুজাতা সবার ছোট। সুজাতার যখন ৮ বছর বয়স তখন ওর মা মারা যায়। বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি। বাবা রেলওয়ে অফিসার ছিলেন। দুই ভাই ব্যবসা করছে। আর সুজাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে অনার্স পড়ছে। বোনটি খুব মেধাবী এবং পড়ুয়া। কিশোরগঞ্জ শহরে ওদের বাড়ির ভাইয়েরা ওখানেই শহরের মধ্য দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে তার এক পারে সুন্দর দোকানপাট করে ভাড়া দিয়েছে, আর বাকীটুকুতে নিজেরা ব্যবসা করছে। ওদের বাবা মল্লিকবাবু মাঝে মাঝে ছেলেদের ব্যবসায় বসে এবং পরিচালনাও করে।

অমরদের বাড়ি টাঙ্গাইল থেকে এসে সুজাতার খুব ভাল লেগেছে। বাবার কাছে সে রাতে নিজের বিপদের কথা ও বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে অমর ও সমরের বাসায় রাত্রি বাস করা এবং মা, কাকিমা ও বাবার আদর যত্নের কথা বলেছে। মল্লিকবাবু শুনে তো অবাক হয়েছেন। এ যুগে এমন সৎচরিত্রের ছেলে পাওয়া খুবই মুশকিল। বাবা বলল, 'মারে আমাকে একদিন টাঙ্গাইল নিয়ে যাসতো।' সুজাতা বলল, 'হ্যাঁ বাবা, ওরা আমাদের সবাইকে যেতে বলেছে। যে ভাল লোক ওরা। বর্তমানে এমন লোকের দেখা পাওয়া ভার।'

দু' বন্ধুর পরীক্ষা শেষ, ভালই হয়েছে পরীক্ষা। ছেলেরা বাড়ি চলে এসেছে। অমর তার কাজ রাজনীতি নিয়ে আরও বেশি করে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঢাকা যাতায়াতের পথে মাঝখানে নেমে সুজাতা মায়েদের সঙ্গে দেখা করে যায়। মায়েরাও মা মরা মেয়েটিকে আদর যত্ন করে। অমর এসে ডাকল, 'সুজাতা শুনে যাও।' এলে বলল, 'বলতো তুমি আমাদের বাড়ি ঘনঘন কেন আসো?'-

– কেন আসি?

– আচ্ছা না হয় আসবো না।

– না-না- এটা আমার কথার উত্তর হলো না, বল কেন আসো?

– মায়েরা আমাকে ভালবাসে স্নেহ করে তাই।

– তাই? আর কিছু নয়?

– অমরদা ভাল হবে না কিন্তু।

– কেন ভাল হবে না, ভালতো হতেই হবে তোমারও সমরেরও।

– এমন করলে আমি আর আসবো না।

– নাই আসলে। তাতে আমার কি? আমি কি তোমার পথপানে চেয়ে থাকি, নাকি তুমি আমার পথপানে চেয়ে থাকো? বাবা মাকে বলবো নাকি এ খবরটা? বাবা পাত্রী দেখার জন্য আমাকে বলেছে। বলব নাকি পাত্রী ঠিক করাই আছে আর দেখতে হবে না। তুমি যার ভরসায় বসে আছ, সে কিন্তু মুখ ফুটে একটা কথাও বলবে না। শেষ পর্যন্ত এই হতভাগাকেই সব করতে হবে। ঠিক করে রেখো কখন কি করতে হবে কাকে কি বলতে হবে। ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো তো আছেই।

সুজাতার ইচ্ছে হলো ঐতিহাসিক সন্তোষের জমিদার বাড়িতে সমরের সাথে বেড়াতে যাবে। অমর এসে বলল, 'আমিও যাবো'। ওরা বলল, ভালই হবে একসঙ্গে গেলে। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মাজার শরীফ দর্শন করবো। সন্তোষ জমিদার বাড়ি, রথখোলা, মন্দির ঐতিহ্যবাহী স্কুল এগুলো দেখতে ওরা দুজনই গেল। মাঝপথে অমর ওদের ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। সন্তোষের নিরিবিলি নিকুঞ্জের নিচ দিয়ে ছায়াবীথিতলে হাঁটতে হাঁটতে সমর সুজাতার অতিনিকটে এসে হাত দুটি ধরে বলল, 'বন্ধু ভাইটি আমার খুবই বুদ্ধিমান, বুঝতে পেরেছে তোমার আর আমার মনের কথা তাই তো অতি সঙ্গোপনে পথ কেটে অন্যদিকে সরে গেল।' সুজাতা সমরের গায়ে গা লাগিয়ে আরও কাছাকাছি এসে বলল, 'কি বুঝাতে চাচ্ছ?'

– কি আর বুঝাব? তুমি কি ছোট খুকী, নাকি অবোধ বালিকা? কিছুই বুঝ না?

– ঠিক আছে যদি সত্যিই কিছু বুঝে না থাক তা বোঝানোর দায়িত্ব আমার। বেলা আস্তে আস্তে ডুবে যাবে। সূর্যের আবির রঙের আলো আঁধারি আলোকে দীঘির পার রোমাঞ্চময় হয়ে যখন উঠবে তখন তোমাতে আমাতে দেখা হবে দুজন।

– যা! আজকাল না তুমি খুব অসভ্য হয়ে উঠেছ, সাহসও বেড়ে যাচ্ছে।

– দেখ সুজাতা দীঘির পার দিয়ে গাছের সারি তার মাঝে মাঝে বিজলীবাতির রোশনাই, মন কেমন আকুল হয়ে উঠে।

শুধুই মনে হয় কি যেন নেই, কি যেন চাই। হয় নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দেই কিংবা আকণ্ঠ অমৃত পান করে তৃষিত আত্মাকে শান্তি দেই।

– এই তোমার আরম্ভ হলো। তুমি তো আগে এমন ছিলে না। আজ বাড়ি গিয়ে মাকে সব বলব।

– বল, বল। মা আগেই প্রস্তাব দিয়েছে। শুধু আমি না করেছি। চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত কিচ্ছু হবে না একথা মাকে বলে দিয়েছি।

অন্ধকার হয়ে আসছে, আবার শীতশীতও লাগছে। ওরা রিক্সা করে বাড়ির দিকে রওনা হলো।

এখন দুই বন্ধুর শুধু একটাই কাজ, কীভাবে কলেজটাকে সুন্দর নয়নাভিরাম করে তৈরী করা যায়। ব্যালকনি কেমন হবে, ছেলেদের কমনরুম, মেয়েদের কমনরুম, ক্যান্টিনের ডিজাইন, কলেজে ঢুকার সদর গেট, ডিজাইন করা খন্ড গেট, প্রফেসরদের কমন রুম, প্রিন্সিপালের রুম, অফিস রুম-এ সবকিছুর ডিজাইন দু'বন্ধু ঢাকা থেকে করে এনে, ওরা ওদের কলেজে মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করাচ্ছে। সারা দিন রাত ওরা ও কাজেই ব্যস্ত। কারণ উকিল বাবুর কথা- আমরা কে কতদিন বাঁচব তাতো বলা যায় না, তাই যা আকাঙ্ক্ষা করেছি তা বাস্তবায়িত করে যাওয়াই ভাল। কলেজ বিল্ডিং-এর কাজ প্রায় শেষের দিকে। এখন শুধু সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ বাকী। নানা কারুকাজেই তো সময় বেশি লাগে। এর মধ্যে রবিবার করে যখন উকিলবাবুর ছুটি থাকে তখন উনিও কলেজ বিল্ডিং-এর কারুকাজ দেখার জন্য সুরুজ যান। সবার প্রচেষ্টাতেই ছেলেরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের কাজ।

সুজাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ শুরু হয়েছে। তাই এখন টাঙ্গাইল খুব কম আসে। তার অবশ্য একটা কারণ আছে, সেটা হলো সমর বলে দিয়েছে সবার আগে লেখাপড়া, তারপরে অন্যান্য কর্তব্য কাজ। একদিন উকিলবাবু সমরকে ডেকে বলল, 'সমর আজ অনেকদিন হয় সুজাতা মা টাঙ্গাইল আসে না, ব্যাপার কি? তোমাদের সঙ্গে কি ঝগড়াঝাটি হয়েছে?'

– না-না জ্যাঠাবাবু ঝগড়া হবে কেন? ঠিক আছে আমি খোঁজ খবর নিব।

– ও তুমিও জানো না, নাকি আমার কাছে লুকোচ্ছ?

– না গো, জ্যাঠা বাবু তুমি যা ভাবছ তা নয়।

উকিলবাবু সমরের কথায় অবাক হয়ে বলল, 'আমি আবার কি ভাবব? তাহলে আসল কথা তুমি বল।'

সমর জ্যাঠাবাবুর কথায় যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তাই আমতা আমতা করে বলল, কিছুই হয়নি, 'আমিই বলেছিলাম লেখাপড়া বাদ দিয়ে টাঙ্গাইল এত ঘন ঘন আসতে হবে না। তাই একটু কম কম আসছে। জ্যাঠাবাবু আমি কি খুব অন্যায় করে ফেলেছি।'

– মোটেই অন্যায় করনি। মেয়েটার বাবা নেই, আমি নেই, একমাত্র অভিভাবক আমাদের সমরবাবু উনিই এখন সব সিদ্ধান্ত নিবেন। আমরা মরে গেলে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।

– জ্যাঠাবাবু তুমি এমন করে বলো না। এতে আমি মনে খুব দুঃখ পাই।

– তাতো পাবেই। যাক সত্যিই যদি দুঃখ পেয়ে থাকো তাহলে আমার দুঃখ লাঘবের জন্য তুমি ঢাকা থেকে আমার মাকে নিয়ে আসবে।

– 'আচ্ছা তাই হবে' বলে সমর উকিল বাবুর ঘর থেকে বের হয়ে আসতেই দেখে মা ও বড়মা দুজনেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসছে। উনাদের হাসতে দেখে সমর বলে উঠল, 'ও এটা তোমাদের যুক্তি, তোমরাই জ্যাঠাবাবুকে বলে আমাকে বকা খাওয়ালে, বেশ করলে তো।' বড় মা ছেলের হাত ধরে বলল, 'বেশ তো ছিল। আবার রাগারাগির কি হলো? যা যা মাকে নিয়ে আয়।' যতীনবাবু, সরলা আরতির ইচ্ছা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই সমর ও সুজাতার বিয়ে হয়ে যাক। কারণ সুজাতারও ইচ্ছা এই কলেজেই সে যোগদান করবে। সুজাতাও ছাত্রী হিসেবে খুবই ভাল। সবার একমত হলে কি হবে সমর চায় না। রোজগার না করে বিয়ে করতে। সমরের মত হলো সারাটা জীবন জ্যাঠাবাবুর ঘাড়ে বসে চালালাম কর্তব্য বলেও তো একটি কথা আছে। এখন বড় হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি, জ্যাঠাবাবুর জন্যই পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল করেছি। তারপরও জ্যাঠাবাবুর উপর নির্ভর করে চলা ঠিক নয়। আমারও তো একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সমর মাকে বলল, 'মা তুমি জ্যাঠাবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলো তো।'

– তা না হয় বুঝিয়ে বলবো, কিন্তু তোমারও তো বয়স হচ্ছে।

– তা হচ্ছে কিন্তু তোমাদের আরেক ছেলে তো আছে, তাকে বিয়ে করাচ্ছ না কেন?

– সবারই হবে কিন্তু তোমার বিয়ে তো ঘরের দোরগোড়ায় এসে গেছে।

– মা যা কর আর নাই কর আমি কিন্তু এখন কিছুতেই বিয়ে করব না।

– ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার জ্যাঠাকে বুঝিয়ে বলব। ছেলের আবার ভারী মান সম্মান বোধ জন্মেছে।

সুজাতা ঢাকা থেকে সরাসরি কিশোরগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ থেকে সরাসরি ঢাকায় যাতায়াত করত। কিন্তু ইদানিং মাঝ রাস্তা টাঙ্গাইল এসে বিশ্রাম নিয়ে ঢাকা যেতো। একদিন রাজনৈতিক কাজে অমর মিটিং করতে ও আলোচনা করতে কিশোরগঞ্জ গিয়ে সুজাতাদের বাড়ি গিয়েছিল। ওখানে নিজের পরিচয় দিয়ে টাঙ্গাইল আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। ধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক অমরের সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হলো এবং একদিন সময় করে যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে টাঙ্গাইলের বাড়িতে চলে এলো।

দশম অধ্যায়

চক্রবর্তী পরিবার আর মল্লিক পরিবারের মধ্যে যাতায়াতের মাধ্যমে আত্মীয়তা গড়ে উঠতে লাগল। পরিবারের সবার সঙ্গে মিশে ধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক খুশি হলেন এবং মনে মনে মেয়ের পছন্দকে সমর্থন করল। কথা প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু যতীনবাবু সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে না দিয়ে বললেন, এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করবো আপনি ধরে নিন। আপনার মেয়েকে আমি আমার বাড়ির মা লক্ষ্মী হিসেবে স্থান দিয়েছি। এ কথা শুনে সুজাতার বাবা আশান্বিত হলেও মনের ভিতরে যেন কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল। সবকিছু শুনে এটাই বুঝতে পারল, সমর কুড়িয়ে পাওয়া এ বাড়ির পালক পুত্র সে তো যতীনবাবুর ছেলেও নয় আত্মীয়ও নয়, কাজেই উনার সম্পত্তির উপর কোন অধিকার সমরের নেই। যা কিছু সম্বল শুধু ছেলেটাই। এত কথা তার মনের মধ্যে দানা বাঁধতে লাগলো।

কিশোরগঞ্জ পৌঁছে মল্লিকবাবু এ বিষয়ে তার দুই ছেলের সঙ্গে আলাপ করলেন। দু' ছেলে একবাক্যে বিয়েতে মত দিয়ে দিল। ছেলেতো দুর্দান্ত প্রতিভাবান। যেখানে যাবে সেখানেই তার চাকরি অবধারিত। সম্পত্তি, সে নিজেই করে নিতে পারবে। বাবা তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

মল্লিক বাবু বলল, 'এমন করে বলো না, এমন স্টার ছেলে আমার সুজাতার ভাগ্যে জুটবে তা কি আমরা কল্পনা করতে পেরেছি। ভাগ্যইতো।'

যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পিতা নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নামে যে কলেজটি তৈরি হচ্ছে তা হলো যতীনবাবুর স্বপ্নের কলেজ। কলেজের অবকাঠামো প্রায় শেষের দিকে। আশেপাশের গ্রাম ও টাঙ্গাইল শহর থেকে লোকেরা কলেজটিতে দেখতে আসে। পত্রিকায় প্রফেসর, প্রিন্সিপাল, ৩য় শ্রেণির ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এগুলো শেষ হলেই একদিন শুভ দিন দেখে কলেজটি উদ্বোধন করা হবে। যতীনবাবুর আজকাল ফুরফুরে মন। কলেজ উদ্বোধন হলেই সমরের কথামত ওর বিয়ের ব্যবস্থা করবে। সমর তার মা ও বড় মাকে বলল, 'দেখ, তোমরা কিন্তু ভুল করছ, আমরা দু বন্ধু যা যা করেছি বা তোমরা যা আমাদেরকে করিয়েছ সবই একসঙ্গে করিয়েছো সেই অন্নপ্রাশন থেকে আজতক যা হয়েছে, সবই একসঙ্গে হয়েছে। এখন এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না। অমরের জন্যও পাত্রী দেখ। আমরা দু'বন্ধু এক সঙ্গেই বিয়ে করব। সবাই বলল, 'উত্তম প্রস্তাব তাহলে সে ব্যবস্থাও হোক।' ওখানেই অমর বসে ছিল। চট করে সে উঠে দাঁড়িয়ে সমরকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুই খাচ্ছিস, তুই খা আবার অমরকে কেন?' সবাই হৈ হৈ করে উঠল এবং বলল, সমর

বিবেকবানের মত কথাই বলেছে। এটা সত্যিই হওয়া উচিত। অমরের পছন্দের কেউ থাকলে বলুক, আর না থাকলেও বলুক। অমর কাচুমাচু হয়ে বাবাকে বলল, 'বাবা হাতের কাছেরটা সেরে ফেল। আমার এখনও সময় হয়নি। যখন সময় হবে তখন আমি তোমাদের জানাব।' এখন আমার নানা কাজ। দেশের কাজ আরও অনেক কিছুই। সমর পারে নৌকা ভিড়াক তারপর আমি হাল ধরে ধরে এগুতে থাকবো। জীবনে সবচেয়ে মহৎ কাজ তো বিয়ে নয়, তাই এটা যখন তখন করা যাবে।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ২রা মার্চ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পিতা নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নামে কলেজটি উদ্বোধন করার দিন ঠিক করা হলো। নিমন্ত্রণ কার্ড ছাপিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে ১৭ই এপ্রিল সুজাতা ও সমরের বিয়ের দিন ধার্য করে ওদের বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে বিলি করতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দুটো কাজই উকিলবাবুর খুবই আকাঙ্ক্ষিত কাজ সেটা হতে পারছে দেখে বাড়ির সবাই আনন্দিত। সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে চলে এসেছে। সুরুজ ও টাঙ্গাইলের বাড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই। ২ মার্চ উদ্বোধনের দিন আর ১৯ শে এপ্রিল বৌভাতের দিন টাঙ্গাইলে অন্যান্য আত্মীয়ের বাড়িতে ইষ্টি-কুটুমদের থাকার ব্যবস্থা করল।

নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কলেজটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে সারা সুরুজ গ্রামটাকেই যেন অপরূপ রূপে সাজানো হয়েছে। উত্তর পাশ দিয়ে ছোট একটি নদী বয়ে গেছে, তারই আর একপাশে বৃটিশ আমলের একটি খাল ঘারিন্দার দিকে বয়ে গেছে। বর্ষাকালে খুব খরস্রোতা হয় খালটি। বর্ষার দিনে তখনকার দিনের লোকেরা নৌপথেই বেশি যাতায়াত করত। কারণ সেটাই আরামদায়ক ছিল। বাজার ঘাট খাওয়া-দাওয়া, সবকিছুই নৌকাতে সুবিধা, তাই ভোর বেলায় লোকেরা ব্যক্তিগত নৌকা ভাড়া করে কিংবা নিজের নৌকা দিয়ে ৭ দিন কিংবা ১৫ দিনের নামে সফরে বের হতো। নৌকাতে রান্নাবাড়ির সু-ব্যবস্থা আছে সপরিবারে এক নৌকায় উঠে আনন্দযাত্রা হতো। কলকাতা, ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, খুলনা, বরিশাল বিভিন্ন জায়গা থেকে জ্ঞানীগুণীর সমারোহে ছোট গ্রাম সুরুজ মুখরিত হয়ে উঠে। সুরুজ গ্রামটিকে এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন টাঙ্গাইলের তিলোত্তমা। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ২ মার্চ যেন ঝলমলে আলোকোজ্জ্বল একটি স্মরণীয় দিন। শুধু কি অতিথীদের সমাদর করা হয়েছে। গ্রামের আপামর সমস্ত জনগণকে সমাদর ও সম্মান দিয়ে যথাযথ আসনে বসতে দেওয়া হয়েছে। তাতে সবাই খুব খুশি। সবাই কলেজের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল এবং এরূপ মহতী কাজের জন্য যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সবাইকে যথেষ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল।

১৯৭৩ সালের ৩ মার্চ থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি শুরু হলো এবং তখন থেকে ক্লাসও শুরু হলো। সেই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের, প্রিন্সিপাল, প্রফেসর, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বরণ করে নেওয়া হলো আড়ম্বরের সাথে। এ কয়দিন ধরে সবাই কলেজের কাজেই ব্যস্ত। যতীনবাবু পুত্রাধিক প্রিয় সমরেশকে নিজে হাতে ধরে প্রিন্সিপালের চেয়ারে বসালো এবং প্রাণঢালা আশীর্বাদ করলো। সমরেশ জ্যাঠাবাবুকে জড়িয়ে ধরে সজোরে কেঁদে ফেলে তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। জ্যাঠাবাবু প্রিয়তম পুত্র সমরেশের মাথায় হাত রেখে চুমু খেয়ে ডায়াস থেকে চোখ মুছতে মুছতে নেমে এলো।

সরলা, আরতি, সুজাতা ও অন্যান্য মহিলারা অদূরে দাঁড়িয়ে এমন অপরূপ দৃশ্য দেখছিল। আর আনন্দাশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল। সুজাতা ভাবছে, এমন ভাল মানুষ আজও আছে পৃথিবীতে, যে হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ আদর দিয়ে পরের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেকে এমন আপন করে নিতে পারে। ধন্য সমরেশের জীবন। জ্যাঠাবাবু তোমার এমন উদারতা ও বদান্যতার জন্য শতকোটি প্রণাম।

ছেলের এহেন সফলতার জন্য মা আরতি অঝোরে কাঁদছে আর ভাবছে সেই দিনের কথা। যে দিন ঘারিন্দা বটতলায় বসে ছেলের ভবিষ্যত চিন্তা করে ভীষণ দুঃখে কাঁদছিল। সেদিন আরতি কোন কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই ভগবান তাকে এমন লোকের হাতে তুলে দিয়েছেন, যার জন্য আরতি ও সমরেশকে পিছনে তাকাতে হয়নি। সরলা নিজেও আনন্দে কাঁদছে, আরতিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আজকের শুভ দিনে চোখের জল ফেলতে নাই। চল দিদি আমরা বাড়ি যাই। এমন সময় মঞ্চ থেকে সমর মা, বড়মা ও অমরকে ডেকে পাঠাল। অমর মা ও কাকিমাকে ধরে ধরে মঞ্চে তুলে দিল। সমর মা ও বড়মাকে প্রণাম করে বলল, 'তোমাদের আশীর্বাদ ছাড়া আজ পর্যন্ত আমি কোন কাজে হাত দিয়েছি অথবা সফল হয়েছি?' দুই মা জোরে জোরে কেঁদে এবং হেসে ছেলেকে আশীর্বাদ করে মঞ্চ থেকে নামিয়ে এনে বলল, 'চল বাবা বাড়ি চল।'

আমাদের সঙ্গে বাড়ি চল, আজ অনেক ধকল গিয়েছে কাল এসে বাকী কাজটুকু করে নিবি, কি বলিস অমর। তুইও আমাদের সঙ্গে চল। দু'জায়ে দু'ছেলের হাত ধরে বাড়ির পথে চলল।

বাড়ি পৌঁছে অমর খুব যত্ন করে বন্ধুকে খাটে বসতে দিয়ে বলল, তুই তো মহাভাগ্যবান, দুটো কাজ একসঙ্গে বাগিযে নিলি। এক চাকরি আর এক বিয়ে। আমি হতভাগা কিছুই করতে পারলাম না। সমর সত্যিই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বলল, আজ এ সমস্ত কথা থাক ভাই। আর একদিন এ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

– ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুই তো আজকের দিনে হিরো। সুতরাং তুই যা বলবি তাই হবে। সুজাতা তুমি অমরের সঙ্গে আলাপ করে ওর মাথাটা ঠাণ্ডা কর।

সুজাতা বলল, 'এসো অমরদা আমরা মায়ের ঘরে যাই।'

– আহা আমি যে সমরের সঙ্গে ঠাট্টা করছি, তাও তোমরা বুঝতে পার না।

– সবই বুঝতে পারি ভাই, কিন্তু ক্লান্ত তাই ও ঘরে যেতে চেয়েছিলাম।

– তোমরা যেথা খুশি হেথা যাও, আমি নাহি যাবো আমার হিরোকে ছাড়িয়া।

– তবে তোমরাই থাকো আমি রান্না ঘরে গিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করি।

– 'বেশ বেশ তুমি তাই কর' বলে অমর সমরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল।

– সমর সত্যি তোর ভাল লাগছে না, না অতি ভাল লাগছে কোনটা?

– দুটোই, যেমন অতি ভাল লাগাটাই ভাল না লাগা। তাই জ্বালা করছে, তুই এখন যা, সুজাতাকে পাঠিয়ে দে।

– বুঝেছি তোকে বুঝবো না। আচ্ছা জ্বালা জুড়ানোর ঔষধ পাঠাচ্ছি।

যতীনবাবু কাপড় ছেড়ে গা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ঘরে এসে বলল, 'চল আজ আমরা সবাই একসঙ্গে খাবো। খাওয়ার টেবিলে খাবার দিয়ে দাও।' আরতি বলল, 'দিদি তাই ভাল হবে। সবাই একসঙ্গে 'খেতে খেতে আমরা অনেক আলাপ করে নিব। কোন কিছুতেই আগের মত আর আলাপ–আলোচনা ও শলা-পরামর্শ করা হয় না।' অমর বলল, খেতে খেতে আলাপ না করে বাবার ঘরে সবাই আমরা বসে সমরের বিয়ের আলোচনা করব। সমরের হবু শ্বশুরও উপস্থিত আছে। কাজেই বিয়ের অর্ধেক কাজ সেরে রাখা ভাল হবে। যতীন বাবু বলল, ' তবে তাই হোক।' মল্লিক বাবু বলল, 'না–না– আমার আত্মীয়-স্বজন ও ছেলেদের ছাড়া কথা বলতে পারব না। তার চেয়ে অন্য দিন সবাইকে নিয়ে বসব, সেটা আপনার এখানে হোক কিংবা আমার ওখানেই হোক।' যতীনবাবু হেসে বললেন, 'দূর মশাই আমরা কি বিয়ে একবারে ঠিক করব, তাতো নয়। শুধু কথাবার্তা বলে রাখি। সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করি। তারপর একদিন আমার বাড়িতে বসেই সব ঠিক করব। আমার বাড়ি কথাটা উল্লেখ করলাম কেন, বুঝেছেন তো? কারণ এ বাড়িতে অভিজ্ঞ মহিলা আছে, আচার, নিয়মকানুন এরা খুব ভাল বুঝে। সেজন্য আমার বাড়ি থেকেই বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হোক।' মল্লিক বাবু এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, 'ঠিক আছে তাই হবে।' খাওয়া দাওয়ার পর হবু বিয়াই বাড়ির সবাই ও অন্য আত্মীয়দের নিয়ে যতীন বাবুর শোবার ঘরে নিচে ফরাস বিছিয়ে সবাই বসল বিয়ে সম্বন্ধে আলোচনা করতে। যতীনবাবু খুশিতে ডগমগ হয়ে গিন্নিকে পান সাজিয়ে আনতে বলল।

শুভ কাজে মসলা দিয়ে সুন্দর করে পান সাজিয়ে নিয়ে এসো। সরলা পান সাজাতে ওস্তাদ। এত সুন্দর করে পানের খিলি সাজায় সেটা খেতে মনে কষ্ট লাগে। তবুও আনন্দ করে সবাই পান খেয়ে জুতজাত হয়ে বসল আলাপ শুনতে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে বিয়ের তারিখ ফেলবে এবং বিয়েটা হবে কিশোরগঞ্জে।

ডিসেম্বরে বিয়ে হবে শুনে অনিমা মহাখুশি, অনিমার শ্বশুরবাড়ি একান্নবর্তী পরিবার। ও পরিবার থেকে বের হওয়াই যায় না। তাই এখন এসে কিছুদিন থেকে আবার ডিসেম্বরে এসে বিয়ে উপলক্ষে অনেকদিন থাকা যাবে। ছোট্ট ফুটফুটে অনিমার ছেলেটা মামাদের চোখের মনি। যেখানে যাবে চাঁদমামা তাদের সঙ্গে আছেই। সবাই ওকে চাঁদ বলে ডাকে। এবার অনিমেষকে নিয়ে আসেনি কিন্তু বিয়েতে তো আর জামাইকে রেখে আসা যাবে না। উপরন্তু বিয়ে উপলক্ষে শ্বশুর বাড়ির অন্য লোকজনও আসবে। অনিমা মাকে গিয়ে বলল, 'মা আমি একবারেই এখানে থেকে যাই। এখন বাড়ি যাব। আবার আসবো। তার চেয়ে থেকে যাওয়াই ভাল।' মা বলল, 'তোর বাড়িতে বলে এসেছিস?'

– না, তা কি করে বলব, আমি কি জানতাম ডিসেম্বরে বিয়ে ঠিক হবে।

– ডিসেম্বর কি কাল? বোকা বোকা কথা বলো না তো। বরং তুমি কয়েকটা দিন বেশি থেকে যাও এবং ডিসেম্বরে না এসে একটু আগে নভেম্বরে এসে কয়েকটা দিন থেকে যেও। তাছাড়া যখনই আসতে মন চাইবে অনিমেষকে সাথে করে নিয়ে আসবে।

– আচ্ছা বেশ আছে তাই হবে।

– দেতো চাঁদ দাদু ভাইকে, দেতো আমার কোলে।

নাতিকে আদরের সাথে কোলে তুলে নিয়ে সরলা নিজের ঘরে চলে গেল। সুজাতা টাঙ্গাইল এসে অনিমার ঘরেই থাকে। সুজাতা আজই ঢাকা চলে যাবে। সব গোছগাছ করছে। এমন সময় অনিমা ঘরে ঢুকে বলল, বেশতো আগেই সব দখল করে বসে আছ।

– নাগো দখল করিনি। তুমি যখন চাইবে তখনই ছেড়ে দিবো।

– কিগো রাগ করলে নাকি? আমি কিন্তু ইয়ার্কি করে বলেছি। কিছু মনে করো না।

– আমি জানি ননদিনীরা এরকম ইয়ার্কি করে এবং বাস্তবেও এরূপ ব্যবহারই করে থাকে।

– এ-মা তুমি সত্যি সত্যি ধরে নিয়েছ? আমি তা বলতে চাইনি।

– ঠিক আছে। তুমি যে আমার ননদিনী রায়বাঘিনী হবে তা কে না জানে?

ভাদ্রমাস। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, এটাকে গ্রামের লোকেরা বলে তালপাকা গরম। সমর আজকাল গ্রামেই বেশি থাকে। সেতো আবার বইয়ের পোকা, লেখাপড়া করতেই বেশি পছন্দ করে। তার ছাত্ররা পড়াশোনা করতে ও জানতে প্রায়ই ওর কাছে আসে। সমরের তাতেই আনন্দ। আর অমর তো রাজনীতি নিয়ে মেতে আছে। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়। পূজার আর মাসখানিক বাকী। কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যতীনবাবু মাঝে মাঝে সুরুজ যায়, কলেজের হাল হকিকত দেখে আসে, তাতে উনার ভাল লাগে। গ্রামের রওশন আলী হাজী উকিল বাবুকে দেখে বলল, কি যতীনবাবু আজকাল ঘন ঘন গ্রামের বাড়িতে দেখতে পাচ্ছি।

– কেন আসতে মানা না কি?

– তা হবে কেন? কীসের মায়ায়? আমাদের তো নয়ই।

– ও এই কথা। নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজের কথা বলতে চাচ্ছেন তো? ঠিকই বলেছেন। চারাগাছটিকে মহীরুহে পরিণত করতে আমারও যেমন যত্ন নেওয়া দরকার, আপনাদেরও তেমন যত্ন দেওয়া দরকার।

– হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো বটেই। আপনাদের মত লোকেরা আছে বলেই না গ্রামের উন্নতি হচ্ছে। বাবু চলুন আমার বাড়ি, দু'মিনিট বসবেন।

– আজ নয়, আজ কাজ আছে, অন্য দিন সময় করে এসে তোমার সঙ্গে অনেক সময় কাটাবো।

যতীনবাবু ও রওশন আলী হাজী দুজনে করমর্দন করে রাস্তার দু'দিকে দুজনে চলে গেল। যতীন বাবু টাঙ্গাইল এসে দেখে বাড়িতে ভীষণ বিপদ। আরতি যেন কেমন অস্থির হয়ে পড়ে গেছে। মাথায় জল ঢালা হচ্ছে, ডাক্তার ডাকতে যাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যতীনবাবু ঢুকতে ঢুকতেই সরলা বলল, 'হ্যাঁ গো তুমি এসেছ দেখ কি বিপদে পড়েছি। দিদিতো কোনদিনও এমন করেনি।' ডাক্তার দেখে ঔষধ লিখে দিয়ে বলল, 'চিন্তার কোন কারণ নেই নিয়মিত ঔষধ খেলে ও খাওয়া-দাওয়া করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন টেনশন করবেন না।'

১১শ অধ্যায়

মায়ের অসুখের কথা শুনে সুজাতা ঢাকা থেকে তাড়াতাড়ি করে টাঙ্গাইল চলে এলো। মা মা বলে ডাকতে ডাকতে সুজাতা বাড়ির ভিতর ঢুকল। মা বিছানা থেকে উঠে বসে বলল, 'কে ডাকে এমন করে?' তাকিয়ে দেখে সুজাতা।

– মারে আয় আয় আমার কাছে আয়, কে তোকে খবর দিল?

– কেন? তোমরা কি আমাকে খবর দিতে চাওনি?

– নারে মা তা নয়। সুজাতা গভীর আবেগে বলল, আমি আমার এক মাকে অবুঝ অবস্থায় হারিয়েছি। তখন জানতাম না কি করে সেবা যত্ন করতে হয়। এখন তো সব বুঝি তাই এখনতো আর অবহেলা করা যাবে না। মাগো বলে সুজাতা মায়ের বুকে পড়ে কাঁদতে লাগল। আরতি সুজাতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দূর পাগলী মেয়ে, আমি তো ভালই আছি কাঁদতে নেই।'

পাশের ঘর থেকে সরলা এসে বলল, 'ওমা কে এসেছে, আমার মা এসেছে নাকি? তাইতো বলি চেনা চেনা গলা মনে হচ্ছে।'

সুজাতা বড়মাকে প্রণাম করে বলল, 'বড়মা আমি কাপড় চোপড় ছেড়ে আসি, জ্যাঠাবাবু এখনও কোর্ট থেকে আসেনি?'

– হ্যাঁ, মা আমি এসেছি, কেন?

– জ্যাঠাবাবু আমি চা করতে যাচ্ছি, চায়ের সঙ্গে আর কি খাবে?

– তুমি যা খাওয়াবে মা, আমি তাই খাবো।

মায়ের অসুস্থতার পর সমর টাঙ্গাইল শহরেই থাকে, মাকে দেখাশোনা করে। আরতি এখন আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠেছে। সুজাতা জ্যাঠাকে বলল, 'জ্যাঠাবাবু আমি পরশু চলে যাবো। লেখাপড়ার খুব চাপ। আবার তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।' জ্যাঠাবাবু বলল, লেখাপড়ার চাপ থাকলে তো যেতেই হবে। সমর বলল, 'সুজাতা চল বিকেলের দিকে নদীর ধার দিয়ে একটু হেঁটে আসি তোমার ভাল লাগবে।'

দুজনে বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে নিরালা মোড় মিউনিসিপ্যালিটি, পাবলিক লাইব্রেরি ডানে রেখে বাদিকে গভ. বয়েজ স্কুল, এস.ডি.ওর বাসা, ফৌজদারী কাচারী পার হয়ে আসামী প্যাটার্নের বাড়ি পার হয়ে বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে একটা রাস্তা দিয়ে ওরা দুজনে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছাল, নদীর পার দিয়ে কি সুন্দর শরতের সাদা কাশফুল ফুটে রয়েছে। সুজাতার ইচ্ছে হলো ছবি তুলবে। সমর সুজাতার ছবি তুলে দিল। এমন সময় সমরের পাশের বাড়ির একটি ছেলে এসে বলল, 'কি দাদা, বিয়ের আগে এত প্রেম ভালো নয়। বাড়ি যান।' ছেলেটির

নাম রতন ঠাকুর সে আবার সুন্দর গান গায়, সমর বলল, 'রতন এদিকে আয় তো। সুজাতার খুব সখ দু'জনের একসঙ্গে ছবি তুলবে।' রতনঠাকুর খুব রসিক। বলল,

– তা চাইবে না, বলো তোর বৌদির সখ একসঙ্গে ছবি তুলবে।

– যা যা তাই হবে তোল ছবি।

সত্যিই রতন ছবি তুললো। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'বৌদি চললাম'। সুজাতা বলল, 'ছেলেটা খুব আমুদে। আমি তোমাদের বাড়ি থাকাকালীন তো একদিনও ওকে দেখি না।'

– আগে খুব আসত, মা ও বড়মার সঙ্গে খুব ভাব। ওরাও রতনকে খুব আদর করত। এখন খুবই কম আসে, কারণ ছোটখাট একটা চাকরি করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গান শেখায়। তাই সময় পায় না। একদিন আসতে বলব। খুব সুন্দর গান গায়। ওর গান তোমার ভাল লাগবে। সব ধরনের গান গায়। যেমন: কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, নজরুল, রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক, পল্লগীতি, হিন্দি প্রায় সব রকম গানের উপরেই তার দখল আছে। দুজনে কথা বলতে বলতে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে খেয়ালই করেনি কখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হঠাৎ করে সুজাতা বলে উঠল, 'এ মা, সন্ধ্যা না ঘোর হয়ে এসেছে। বাড়ির সবাই কি ভাববে! আমার ভারী লজ্জা করছে। হয়তো আবার ভেবে না বসে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মেয়ে। বের হয়েছে তো আর বাড়ির কথা একদম ভুলে গেছে।'

– আবোলতাবোল কথা বাদ দাও। এতদিনে তুমি আমার বাড়ির লোকদের এই চিনলে?

– নাগো বিবেকের কাছে আমার খারাপ লেগেছে তাই বলে ফেললাম।

– চল, পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি চল।

আরতি চাচ্ছিল সমর আর সুজাতার বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক। পোড়া কপালে যদি নাতি-নাতনির মুখ দেখে যেতে পারতাম তাতে মরেও শান্তি পেতাম। যতীন বাবু মেয়েদের কথার খুব মূল্য দেয়। তাই আরতির ইচ্ছাকে পূর্ণসমর্থন জানিয়ে বিয়ের দিন ঠিক করে ডিসেম্বরেই জাকজমকপূর্ণভাবে সমর ও সুজাতার বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলল। সুজাতা মনে মনে একটু আপত্তি করেছিল, কারণ কয়দিন পরেই সুজাতার ফাইনাল পরীক্ষা। সবাই যেখানে একমত সেখানে সুজাতার কথা কেউ মেনে নিবে না, তাই সুজাতা তার আপত্তির কথা উত্থাপনই করে নাই। কথা প্রসঙ্গে অমরকে বলেছিল, 'সবাই যেখানে একমত তাই আমি সেখানে বেয়াদবের মত অমত করিনি।' অমর বলে উঠল, 'হ্যাঁ এটা একটা কথা হলো, পারলে আরও কয়মাস আগেই তুমি তারিখ ফেলাতে বলতে। পেটে খিদে, মুখে না করছ কেন?'

– ওমা বড়মা দেখছো কেমন করছে?

– এখন আবার মা কেন? শুধু মা নয়, বড়মাকে সঙ্গে টানছে। এই কি করবে মায়েরা ঠিকই তো বলেছি, আমরা বুঝি কিছু বুঝি না। বড় মা এসে বলল, সারাক্ষণ মেয়েটার পিছনে লেগে থাকিস কেনরে? কি করেছে তোদের। যা এখন খাওয়ার সময় হয়ে আসছে, দু'ভাই মিলে খাওয়ার জায়গা কর। আর মা তুমি খাবার বেড়ে টেবিলে সাজিয়ে দাও। সুজাতা অমরের দিকে তাকাতে তাকাতে মিটিমিটি হাসতে হাসতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অমর সুজাতার হাসি দেখে, জিভ বের করে ভেঙিয়ে বলল, 'সময়মত এর প্রতিশোধ নিবো। মা, কাকিমাকে দিয়ে বকা খাওয়ানো, দেখাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ভাত নিয়ে এসো। সমর আয় ভাত খেয়ে যা আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

ইতোমধ্যে যমুনা-মেঘনায় অনেক জল গড়িয়ে গেছে। যতীনবাবু, সরলা ও আরতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগের মত যতীনবাবু আর খাটতে পারে না। তার তিনজন জুনিয়র উকিল ও ৩ জন মুহুরী দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়। আরতির হার্টের অসুখ বেড়েছে। দু চারদিনের মধ্যে আবার ঢাকা যাবে ডাক্তার দেখাতে। সবার মধ্যে সরলাই একটু সুস্থ আছে। কতই আর সুস্থ থাকবে বয়স তো বাড়ছে। সুজাতা অতি যত্নের সঙ্গে সবার সেবা করে। সমর তার কলেজ নিয়ে ব্যস্ত। অমর স্বাধীনতার চেতনার সরকার পতনের পর গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দেশের পরিস্থিতি ভাল নয়। নতুন সরকার দেশ পরিচালনা করছে। সুজাতার একখানা কন্যা হয়েছে। যতীনবাবুতো ভয়ানক খুশি- এতদিনে ভগবান মুখ তুলে তাকিয়েছে। আমাকে দেখার একটা লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। উকিল বাবু নাতনির নাম রেখেছে সুদীপ্তা। মেয়েও তেমনি, দাদা বলতে অজ্ঞান, এই বয়সেই দাদার গামছা, পায়ের চটি ও লাঠি এগিয়ে এনে দাদুর হাতে দিয়ে বলবে এই নাও তোমার জিনিস। দাদা খুশিতে আটখানা হয়ে কোলে তুলে নিয়ে বলে, 'এই না হলে আমার নাতনি। ও সরলা ও আরতি তোমরা দেখে যাও আমার নাতনির কাণ্ড।'

অমর অনেকদিন পালিয়ে থাকার পর, দেশে এসে ধরা দিলো, তখনই সরকার অমরকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠাল। যতীনবাবু এ সময় খুব অসহায় হয়ে পড়ল। এদিকে আরতির অসুখ বাড়তে লাগল। যখন বিপদ আসে, তখন চতুর্দিক থেকে বিপদ ঘিরে রাখে। সমর কলেজে ছুটি নিয়ে মেয়েকে বড়মার কাছে রেখে সুজাতাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় সমর হার্টের বড় হাসপাতালে মাকে ভর্তি করল।

সুজাতার সেবা যত্নে হাসপাতালের সবাই মুগ্ধ হয়ে ওর প্রশংসা করতে লাগল। মহিলারা জিজ্ঞেস করে, 'দিদি মেয়েটা আপনার কে হয়?'

আরতি বলল, 'আমার মা হয়গো, আগের জন্মে হয়তো ও আমার মা ছিল, তাই এত সেবাযত্ন করছে।'

মহিলারা বলল, 'সত্যিই তাইগো'।

আরতি বলল, 'আমার ছেলের বৌ।'

– দিদি আপনি ভাগ্যবতী তা না হলে এত সেবা যত্ন আপনি পেতেন না। কিগো মা যেমন সেবা করে যাচ্ছ। তেমনই করে যেও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।

আরতির হার্টে রিং পরাতে হবে। অপারেশনের দিন সবাই ঢাকায় এসে কেঁদে কেটে একশা। পরিবারের মধ্যে যে এত বন্ধন থাকে তা সচরাচর দেখা যায় না। আরতি মনে মনে ভেবেছে ওদের সঙ্গে তো আমার কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, সামাজিক বন্ধন নেই। আত্মীয়তার কোন সম্পর্কও নেই। তবে কীসের টানে উকিল বাবু আমাদের হৃদয় দিয়ে একান্ত আপন করে রেখেছে। সেটা কি আত্মার টানে? বাড়ির একটি রাঁধুনীকে বাড়ির মালিক এতখানি সম্মান, আদর, যত্ন, মায়া, মমতা দিয়ে আপন করে রেখেছে। এ বাড়িতে না আসলে আরতি সেটা কিছুতেই বুঝতে পারত না। উকিল বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আরতির মাথা নত হয়ে আসে। যখন স্ট্রেচারে করে আরতিকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন আরতি উকিলবাবুকে ডেকে বলল–

– দাদা, আমাকে মাফ করবেন, আর আমার ছেলেটার ভার আপনার উপর দিয়ে গেলাম। আরতি হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

– আরতি কাঁদবে না, তোমার কিচ্ছু হবে না, তুমি ভাল হয়ে আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবে। তোমার ছেলে বউ, নাতনি সবাইকে পাবে। আমার লক্ষ্মীবোন তুমি কান্না করে সবার মন খারাপ করে দিও না।

অপারেশন থিয়েটারে আরতিকে ঢুকানোর পর সবাই উৎকণ্ঠায় নীরবে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ কোন কথা বলছে না। যার যার নিঃশ্বাসের শব্দ তারা শুনতে পেল। ওখান থেকে ঘরে এসে সুজাতা হাসপাতালের করিডোরে একটা চেয়ারে বসে কাঁদতে লাগল। সবারই মন খারাপ, সবারই কান্না কান্না ভাব। অপারেশন শেষ করে ডাক্তার সেকান্দার আলী বলল, 'অপারেশন সাকসেস ফুল। কোন চিন্তা নেই। আগামীকাল উনাকে বেডে দেওয়া হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যেতে পারেন।' ডাক্তারের এ কথা শুনে হাসপাতালে উপস্থিত আত্মীয়রা সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যার যার মত চোখ মুছে ওখান থেকে সরে গেল।

বৌদি সম্পূর্ণ আরোগ্য হলে বাড়ি নেওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল। কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। এর মধ্যে একদিন উকিল বাবু টাঙ্গাইল চলে এলো

সংসারও তো দেখতে হবে এবং টাকা পয়সার দরকার আছে। সমর আর সুজাতা মাকে দেখভাল করার জন্য ওখানেই রয়ে গেল। যতীন বাবুর সঙ্গে সরলা ও সুদীপ্তা হঠাৎ করেই হাসপাতালে এসে উপস্থিত হলো। সুজাতা বলল,

– বড়মা কি করেছেন? হাসপাতালে ওর ঠাম্মিকে এ অবস্থায় দেখলে ভয় পাবে, কান্নাকাটি করবে, সামলানো খুবই মুশকিল হবে।

– তুমি ভয় পেওনা, ঠাম্মিকে দেখলে আমার দিদু অনেকটা শান্ত হবে ওকে বাড়িতে রাখতেই পারছিলাম না। আমরা তো এখানে সবাই আছি। আরতি দিদির মনটা ওর জন্য কেমন কেমন করছে, আর দিদুর মনটাও ঠাম্মির জন্য কেমন কেমন করছে। কাজেই দুজনে দুজনকে আত্মা ভরে দেখুক। দেখে শান্ত থাকুক। কষ্ট দূর হোক। কেউতো কারও পর নয়। আমারও তো দিদির জন্য খুব খারাপ লাগছিল। এই যে দেখা হলো এখন মনে অনেক শান্তি পাবো।

আরতি সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরই তাকে হাসপাতাল থেকে টাঙ্গাইলের বাড়ি নিয়ে আসা হলো। বাড়ি এসেও তাকে সম্পূর্ণ সুজাতার তত্ত্বাবধানেই রাখা হলো। একটা ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্সও সুজাতার মত এত সুন্দর করে রোগীর পরিচর্যা করতে পারবে না। সমস্ত অন্তর দিয়ে নিজেকে নিবিষ্ট করে সেবা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। সুযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়ে আরতি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠল। আরতি সুস্থ হওয়ার পর সুজাতা কলেজে যোগদান করল। বড়মা সুজাতাকে বলেছিল, কয়েকদিন বিশ্রাম নাও, ধকল তো তোমার উপর দিয়ে কম যায়নি। এমন করতে থাকলে তুমিও অসুস্থ হয়ে পড়তে পার। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কলেজ তো নতুন। স্টাফও বেশি নেই, ওখানেও মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে। ছাত্রদের রেজাল্ট ভাল করতে হবে। শুধু নিজের শরীর নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না, ছাত্রদের ভবিষ্যৎও দেখতে হবে। সব কিছু ভেবেচিন্তে সুজাতা কলেজে যোগ দিল। সুজাতা কলেজে যোগ দিক এটা সমরও চায়।

চক্রবর্তী পরিবারে সবাই সুখেই আছে। এর মধ্যে অমরেশ জামিনে মুক্তি পেয়েছে তাতে সবাই খুশি। সমর বলল, 'শোন অমর, এবার থেকে বাড়ির বাইরে কম যাবি, জ্যাঠাবাবু ও বড়মার কাছে কাছে থাকবি। দেখতে পাচ্ছিস তো তাদের অবস্থা। শরীর ও মন দুদিকেই খারাপ। রাজনীতি করিস। একটু রয়ে সয়ে কর, উনারা সুস্থ থাকুক। উনাদের ভাল রাখার চেষ্টা কর, বড়মা সহ্য করতে পারে না। তাই কেঁদে কেটে মনের দুঃখ প্রকাশ করে। জ্যাঠাবাবু প্রকাশ করতে পারে না বলে মনের দুঃখ মনে চেপে রাখে। জ্যাঠাবাবুর চোখমুখের অবস্থা দেখেছিস।'

প্রচণ্ড শরীর খারাপের মধ্যে ডাক্তার দেখানোর পর জানা গেলো, সুজাতা মা হতে চলেছে। খুব কষ্ট সহ্য করে সুজাতার একটি পুত্র সন্তান জন্মাল। তার নাম

রাখা হলো 'সুদেব'। তারপর থেকে সুজাতার শরীর আস্তে আস্তে হয়ে সুস্থ হয়ে উঠল। বাড়ির সবাই বিয়ে করার জন্য অমরকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু অমরকে কিছুতেই রাজী করানো যাচ্ছে না। সুজাতা বলল, 'তোমাকে দেখাশুনার তো লোকের দরকার, কে দেখবে তোমাকে?'

– কেন তুমি দেখবে।

– তা হয় না, তোমার বন্ধুকে কে দেখবে।

– দু'জনকেই তুমি দেখবে।

– তা কখনো সম্ভব নয়।

– তোমার বোন থাকলে না হয় দেখা যেতো।

– ও সমস্ত বাদ দাও, বড় মাকে বলে আমরা পাত্রী দেখা শুরু করবো। অমত কোরো না কিন্তু। কিছুতেই সুজাতা অমরকে রাজি করাতে পারছে না। তাছাড়া রাজনীতি করে এমন ছেলেকে মেয়েরা ও অনেক পরিবার পছন্দ করে না। পছন্দ নাই করুক চেষ্টা করতে দোষ কি? সুজাতা শ্লোগানের সুরে বলল,

– এবারের চেষ্টা অমরের পাত্রী দেখা। আমাদের চেষ্টা বৃথা যেতে দিব না। অমর হো হো করে হেসে বলল, 'সুজাতা তুমিতো নেতা হয়ে যাচ্ছ?'

– তোমার পাল্লায় পড়লে হতেই হবে।

– বেশ, তাহলে আমি একজন নেত্রীকে পাবো।

– ইয়ার্কি বাদ দাও আমার দেখা একটা মেয়ে আছে, বল কবে দেখতে যাবো। পছন্দ হোক বা না হোক, দেখতে দোষ কী? আমি তোমার পাত্রী ঠিক করে বাড়ির সবার পছন্দ ও তোমার পছন্দসই পাত্রীকেই নিয়ে আসব।

১২শ অধ্যায়

স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দলটি আবার তারা নির্বাচন করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করল। এ সরকারে অনেক নতুন মুখ মন্ত্রী হিসেবে দেখা গেল। অমরেশ চক্রবর্তীও তার এলাকায় বিপুল ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে।

রাজনৈতিক পর্যায়ে উচ্চতর নেতাদের কাছে অমরেশ খুবই প্রিয়ভাজন ও বিশ্বাসযোগ্য। এবার অমরেশ চক্রবর্তীকে মন্ত্রীর আসন দেওয়া হলো। উপ শিল্পমন্ত্রী হিসাবে তাকে সমস্ত প্রকার সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হলো। বাড়ির সবাই তার বিয়ের জন্য খুবই জোরাজুরি করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই সে রাজী হলো না। তার এককথা- যখন সময় হবে তখন আমিই তোমাদের বলবো। সরলা

অমরকে বলল, 'আর অমত করিস না। আমরা সবাই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। সব কাজের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছি। বাড়ির দেখভাল কে করবে? ঢাকায় তোকেই কে দেখবে? তোর বাবা তো দুদিন পর কোর্টেই যেতে পারবে না। তোকে তো বাবা এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে ছেলে দেশের দায়িত্ব অনায়াসে কাঁধে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। সে ছেলে তো অকর্মণ্য নয়। তোকে মা-বাবাকে যেমন দেখতে হবে। তেমনি দেশকেও দেখতে হবে।'

– মাগো, আমার অনেক কাজ আছে, সময় হলে সব হবে।

মা স্বগোতোক্তি করতে লাগল, 'আমার ছেলেকে ভগবান কবে যে সুমতি দিবে তা তিনিই জানেন।'

আজকাল উকিলবাবুরও মন মেজাজ বেশি ভাল যাচ্ছে না, কারণ মাঝে মাঝেই তার শরীর ভাল থাকে না, যতটুকু ভাল থাকে, ঐ দু'জন- সুদীপ্তা ও সুদেবের জন্য। প্রায়ই উকিলবাবু বলে, 'দিদিভাই, তোমাদের জন্যই আমরা বেঁচে আছি। তোমাদের মুখ দেখেই আমরা শান্তি পাই এবং পরমশান্তিতে আছি।'

মন্ত্রী সাহেব মন্ত্রীত্বে বহাল হয়ে ঢাকায় থাকছেন। একদিন টাঙ্গাইল এসে মাকে বলল, 'মা আরতো পারি না, তুমি ঢাকা এসে কয়দিন থাকো না মা।'

– কি বলিস, আমার কি আর সেই দিন আছে, শারীরিক মানসিক সবদিক দিয়েই আমি দুর্বল।

– তা হলে সুজাতাকে পাঠাও।

– এটা কি বলছিস, ওর কলেজ, দু'টো সন্তান, আমরা বুড়ো-বুড়ী আর সমর, এই লোকগুলোর কি হবে? ওদের দেখবে কে?

– সে এক ব্যবস্থা হবেই, চিন্তার কোন কারণ নেই। ওকে কলেজে পড়াতে হবে না, বাচ্চাদের ঢাকাতেই ভাল স্কুলে ভর্তি করাব।

– আমি এ বিষয়ে কোন মতামত দিতে পারব না।

এ সমস্ত কথাবার্তা সবই সুজাতা শুনেছে, শুনে তার একটুও ভাল লাগেনি। কিছুতেই সে ঢাকা যেতে রাজী নয়। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরে এসে সমরকে তার অনিচ্ছার কথা জানিয়েছে। সমর উত্তর দিয়েছে, 'যখন সময় আসবে তখন দেখা যাবে, এখনই এত অধৈর্য হয়ে উঠছ কেন।'

– আমি সবাইকে নিয়ে এক সংসারে সুখে দুঃখে আদরে-যত্নে একসঙ্গে থাকতে চাই। এ সংসারে আমি মন্ত্রী দেখে বিয়ে করিনি, আমার দেবতুল্য স্বামী নির্বিবাদি মানুষ, পরিবারের সবার প্রিয় ব্যক্তিটিকে আমি বিয়ে করেছি। তোমাকে বলে রাখছি আমি কিন্তু এ সংসার ছেড়ে ঢাকা গিয়ে কিছুতেই থাকবো

না। আমি আগেই বলে রাখলাম শেষে তুমি আবার বন্ধুর পক্ষ নিয়ে আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে না দাও। তিন তিনটা লোক বৃদ্ধ, এদের চাকরবাকরদের উপর ছেড়ে রাখা যায়? আমি কিছুতেই পারবো না।

টাঙ্গাইলের বাড়িটির সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে। বাড়ির সামনে যে মাঠ, সেটাকে নানারকম ফুলের গাছ লাগিয়ে দু'ধার দিয়ে বাগান ও মাঝখানে বাঁধানো রাস্তা এবং পাশে গাড়ি পার্কিং করার জায়গাও রাখা হয়েছে। প্রধান গেইট কারুকাজ করে সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে। কেউ এ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। এ যেন কোন রাজবাড়ি। অমরের গাড়িটি সর্বদা বাড়ির ভিতর রাখা হয়। মন্ত্রীর গাড়ি বলে কথা। আবার ঢাকায় মিন্টো রোডে তো একখানা বাড়িও পেয়েছে। সেটাও যথেষ্ট সাজানো গোছানো। এত সুন্দর বাড়ি পেয়ে বাড়ির সবাই গৌরবান্বিত। কাকা টাঙ্গাইল এসেই ওদের নিয়ে সেখানে বেড়াতে যায়। তাছাড়াও বিভিন্নস্থানে অমরকে প্রধান অতিথি করে ও অভ্যর্থনা জানানো হলে সে সুদীপ্তা, সুদেব ও সুজাতাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

সুজাতা না যেতে চাইলেও অমরের সম্মানার্থে ও অনুরোধে যেতে হয়। না গেলে আবার সমরও মনঃক্ষুন্ন হয়। মাঝে মাঝে মা, বড় মাও ওরা গেলে খুব খুশি হয়। তাই হাজারো ইচ্ছা না থাকলেও অনুরোধে এগুলো করতেই হয়। সুদীপ্তা লেখাপড়ায় ওর বাবার মত হয়েছে এবং সেও ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে। কাকিমা আরতি চায় সবাই একসঙ্গে আগের মত থাকুক। এতটুকুও যেন মনমালিন্য না হয়। সুদীপ্তা কাকুর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে খুবই পছন্দ করে। একদিন কাকুকে বলেই ফেলল, 'কাকু তুমি যখন বিদেশ সফরে যাবে তখন আমাকে নিয়ে যাবে, আমার খুব সখ বিদেশ ঘুরে দেখার ও জানার। দেশ-বিদেশ ঘুরে নানা জ্ঞান অর্জন করারও আমার ইচ্ছে।'

পরপর ৩ বার অমরেশ মন্ত্রী হলেন। এবার উনি শিল্পমন্ত্রী হিসেবে পূর্ণমন্ত্রী হলেন। সুদীপ্তা এস.এস.সি. তে ভাল রেজাল্ট করেছে। ওর কাকু অমরেশ ইডেন কলেজে ভর্তি করে দিয়েছে। ওখানে সে হোস্টেলে থাকে এবং ওর কাকু ওকে মাঝে মাঝে মিন্টো রোডের বাড়িতে নিয়ে আসে। কলেজে এবং হোস্টেলে সবাই সুদীপ্তাকে অন্যরকম সমাদর করে। তাতে সুদীপ্তা মনে মনে খুবই গৌরব অনুভব করে। সমরের মনটা খুবই খারাপ। মা আরতির শরীরের অবস্থা ভাল নয়। অমর টাঙ্গাইল এসে সমরকে বলল, 'কাকিমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঢাকায় আয়, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' সমর বলল,

– যেতে তো হবেই, কিন্তু মা কোথাও যেতে চায় না।

– না চাইলেও জোর করে নিয়ে যেতে হবে, তুই না একমাত্র ছেলে, তুই চাস না কাকিমা তাড়াতাড়ি ভাল হোক?

– কে না চায়, মা সুস্থ হয়ে উঠুক।

– ঠিক আছে আমি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং হাসপাতালে ডাক্তারের সঙ্গেও আলাপ করে রাখব যাতে ভর্তি হতে কোন অসুবিধা না হয়।

– তুই আছিস বলেই না আমি এত ভরসা পাচ্ছি। মার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার মত সাহস পাচ্ছি। তুই না থাকলে এতবড় দায়-ভার কিছুতেই আমি নিতে পারতাম না।

– তুই চুপ কর, কাকিমা কি আমার পর, জীবন-মরণ পণ করে সে আমাদের সেবা–শুশ্রূষা আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে মানুষ করেছে। উনার প্রতি আমার দায়িত্ব নেই?

পরের দিন অ্যাম্বুলেন্স আসার সঙ্গে সঙ্গে সমর মাকে নিয়ে ঢাকার পথে রওনা হলো। যতীনবাবুরও শরীরটা খুব একটা ভাল নেই, তাই সুরুজ থেকে আত্মীয় এনে বাড়িতে রাখলেন, যাতে যতীনবাবুর কোন অসুবিধা না হয়।

সুজাতা ও বড়মার মন খুবই খারাপ। তারা ভগবানকে ডাকতে ডাকতে ঢাকার পথে গেল। ঢাকায় পৌঁছেই যতীনবাবুকে ফোন করা হলো। ঐ দিনই আরতিকে ভর্তি করা হলো। সমরের কিছুতেই ভাল লাগছে না। কোথায় কলেজ, কোথায় সংসার, শুধু মায়ের জন্য তার ভাবনা। মায়ের আরোগ্যের জন্য কত মানত, কত প্রার্থনা করছে, আর কানছে। হাসপাতালে ভর্তি করেই সমর আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ল। ডাক্তাররা যত আশ্বাস দিক তবুও সমর যেন কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না। বড়মাকে জড়িয়ে ধরে বলল,

– বড় মা আমি কী করব। কী নিয়ে বাঁচব?

– পাগল ছেলে, দিদির কিছু হবে না, আমরা আছি না, তোর বড়মার প্রতি তোর বিশ্বাস নেই, ভরসা নেই।

– বড় মাগো আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তোমরা সবাই ভগবানকে ডাকো, প্রার্থনা কর।

– দিদির জন্য তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। সে যে আমার কত প্রিয় তা কি তুই জানিস না? দিদির জন্য আমি সব করতে পারি।

– আমি সব জানি, সব বুঝি, তবুও কি করব।

হাসপাতালে তিনদিন আরতি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে এক সময় হেরে নীরব- নিশ্চুপ হয়ে পড়ল। সংবাদ পেয়েই অমর তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে চলে এলো। এসে দেখলো সমরকে কেউ মানাতে পারছে না। অমর সমরকে বুকে চেপে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু কে তার সান্ত্বনা শুনে। যত সান্ত্বনা

দিচ্ছে সমর ততই যেন বেশি করে অস্থির হয়ে পড়ছে। অমর সবাইকে সাবধান করে দিল। কাকিমার মৃত্যু সংবাদ যেন বাবাকে এখনই দেওয়া না হয়।

যখন সময় হবে আমি দেব।

ফোন করে অমর জানালো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবো বলেই ফোন কেটে দিল। যতীনবাবু বিরক্ত হয়ে বলল, এ কেমন ছেলে, দুটো কথা বলবে। আরতির শরীর এখন কেমন আছে? ডাক্তার কি বলল। কিছুই না বলে ফোন কেটে দিল। যতীনবাবু আবার খুব ধৈর্যশীল লোক, ভাবল থাক এসেই তো পড়েছে। তখনই সব কিছু শোনা যাবে। মনে মনে ভাবল, আজ কোর্টে যাবো না। স্নান করে খেয়ে একটু ঘুমাবো। শরীরটা যেন কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। আরতির সর্বদা মঙ্গল কামনা করত যতীনবাবু। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে একান্ত আপনজনের মত তার বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিল। আরতির আচার ব্যবহারে বাড়ির সবাই সন্তুষ্ট। তারাও সবাই আপন করে নিয়েছিল।

সরলাতো নিজের দিদিই মনে করতো। দুজনের মধ্যে কোনদিন এতটুকুও কথা কাটাকাটি হয়নি। আরতি কোনদিনও যতীনবাবু ও সরলার মুখে মুখে কথা বলেনি। ওর ছিল সৎস্বভাব। কারো মনে কখনও ব্যথা দিত না, সবাইকে আপন ভেবে ভালোবাসত।

দুপুর নাগাদ অমর ও বাড়ির সবাই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে টাঙ্গাইলের বাড়িতে এসে পৌঁছাল। অ্যাম্বুলেন্সের সামনে এসে যতীনবাবু থমকে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ অমর গাড়ি থেকে নেমে বাবাকে ধরে ফেলল, বাবা অমরের কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে নেতিয়ে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে যতীনবাবুকে সবাই ধরে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। কান্নাকাটির শব্দ শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা এসে হতবাক হয়ে গেল। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি এমন অবস্থা হবে। সবাইকে হাত ধরে ধরে গাড়ি থেকে নামানো হলো, কিন্তু সমরকে মায়ের কাছ থেকে কেউ একচুলও নড়াতে পারল না। অমর মহামুশকিলে পড়ে গেল। সবাই যদি এমন অবুঝ হয়ে যায় তবে কেমন হবে। অমর মাকে হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে ঘরে বাবার কাছে গেল। বুড়ো-বুড়ি দুজনে জড়াজড়ি করে কাঁদতে লাগল। অমর বাবাকে বলল– 'বাবা তুমি তো এমন অবুঝ নও। তুমিই তো আমাদের শিখাতে বিপদে ধৈর্যহারা হতে নেই। তবে তুমি কেন এমন করছ?' ও বাবা, শান্ত হও। সমরকে দেখ, আমি ওকে মানাতে পারছি না। একমাত্র তুমিই পারবে ওকে শান্ত করতে। বাবা, ওঠ চল, আমার হাত ধর। যতীনবাবু নিজের হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে অমরকে ধরে আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির সামনে এসেই গাড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল অমরের বাবা। অমর বাবাকে পড়তে না দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখল।

– বাবা, এই যে তোমার সমর, ওর দিকে তুমি তাকাবে না, তুমি ওকে আমার চেয়েও ভালবাস! তুমি ছাড়া ওর তো কেউ রইল না।

– হ্যাঁ আয় বাবা সমর, আমার বুকে আয়, তোর জ্যাঠাতো আছে। আয় জ্যাঠার বুকে আয়।

জ্যাঠাবাবুর গলার আওয়াজ পেয়ে সমর আরও জোরে কেঁদে উঠে জ্যাঠাবাবুর বুকে আশ্রয় নিল। জ্যাঠাবাবুও ওকে বুকে ধরে গাড়ির বাইরে নিয়ে এলো। একখানা চেয়ারে বসিয়ে জ্যাঠাবাবু বুঝাতে লাগল। অমরও বাবার সঙ্গে সায় দিয়ে সমরকে বুঝাতে লাগল। পাড়ার লোকেরা এসে শবদাহ করার ব্যবস্থা করতে লাগল এবং উকিল বাবুর কাছ থেকে বিভিন্ন নিয়মকানুন জেনে নিচ্ছিল। সরলা যেন একলা হয়ে গেল। সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল বাড়ি থেকে দু'জনে একসঙ্গে বের হয়ে গেলাম। আর কি কপাল আমার, ফিরে এলাম একা। আমার এতোদিনের সঙ্গী ছেড়ে আমি কী করে থাকবো। সরলা সুজাতার কাছে যেয়ে সুজাতার গলা ধরে কাঁদতে লাগলো। মায়ের আদর যে কি তা সুজাতা জানত না, বিয়ের পর বুঝতে পেরেছে মা কেমন, তার স্নেহ আদর ভালবাসা অতুলনীয়। সুজাতার মুখে কোন কথা নেই একেবারে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। পাড়ার গুরুজনেরা বলল, 'যতক্ষণ লাশ বাড়ি থাকবে ততক্ষণ আহাজারি চলতেই থাকবে। কাজেই লাশ তাড়াতাড়ি সরানোর ব্যবস্থা কর।' সব কিছু তাড়াতাড়ি করার ব্যবস্থা করা হলো এবং লাশকে শ্মশানে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। সমগ্র গ্রামের লোকজন এ সংবাদ শুনে তারাও শ্মশানের দিকে যাত্রা করল। সমরকে কেউ ধরে রাখতে পারে না। এত শান্ত এত বোদ্ধা ছেলেটি একেবারে কেমন যে অবুঝ হয়ে পড়েছে। অমরের যতখানি চেষ্টা করার সবটুকুই সে করেছে।

শ্মশানের শব কৃত্য শেষ করে সমর বাড়িতে এসে ঠাস করে বসে পড়ে মা-মাগো তোমার সমস্ত অস্তিত্ব আজ শেষ হয়ে গেল। মা-মাগো করে কাঁদতেই লাগল। জ্যাঠাবাবু সমরের কাছে এসে বলল, 'বাবা এরকম করলে হবে, মানুষ মরণশীল এটাই তো হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কে বলল, আরতির অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে, আরতি তোর মধ্যে সুদীপ্তার মধ্যে সুদেবের মধ্যে। সবার মধ্যেই ওর রক্ত বয়ে গেছে। ওঠ বাবা, এখন মায়ের প্রতি করণীয় কাজ নিয়ম অনুসারে করতে হবে।' সরলাকে ডেকে যতীনবাবু বলল, 'কি কি করতে হবে করিয়ে ওকে ঘরে নিয়ে যাও। আর সুজাতা, দিদি ভাই ও দাদু ভাইকে সমরের পাশে বসিয়ে দাও। ওদের দেখে তবুও শোকটা কিছু প্রশমিত হবে। সমর উত্তরীয় পরে মেঝেতে একটা চাদরে বসে রইল। সুজাতা, সুদীপ্তা ও সুদেব কাপড় ছেড়ে সমরের পাশে এসে বসলো। সুজাতা বড়মার কাছে গিয়ে বসে বলল, 'বড়মা, তোমরা স্নান করে কিছু মুখে দাও, তোমাদের তো অশৌচ

হয়নি।' সুজাতার হাত দু'খানি ধরে বড় মা বলল, 'অশৌচ হয়নি বলে কি খাবার গলা দিয়ে নামবে? সে আমি কিছুতেই খেতে পারবো না।' পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলাকে ডেকে বলল, খাবার না দিতে পারতে এক কাপ করে চাতো দিতে পারবে। কাকিমা উনাদের বাঁচান গলা শুকিয়ে গিয়েছে, যেমন করে পারেন, একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। মহিলাটি উঠে রান্না ঘরে গিয়ে সত্যই চা করে যতীনবাবু ও সরলাকে জোর করে খাওয়ালো। পাশের বাড়ির একজনে এসে গরুর দুধ দিয়ে গেল। সমরদের জন্য কিছুটা দুধ রেখে বাকীটুকু যতীনবাবু ও সরলার জন্য রান্নাঘরে জ্বাল দিয়ে উনাদের খাইয়ে দিল। সে কি উনারা খেতে চায় না, সুজাতা বকে, কথা শুনিয়ে দুজনকে খাওয়ালো। যথা সময়ে আরতির আদ্যশ্রাদ্ধ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। সমরের চুল কেটে ফেলেছে। শরীরের অবস্থাও খুব খারাপ। একমাত্র মা ছাড়া তো সমরের আর কেউ ছিল না। কীভাবে সমরের দিন কাটবে এ কথা সমর ভাবতেই পারে না, মায়ের অবর্তমানে সমরের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। সুদীপ্তা ঠাম্মির শ্রাদ্ধের পর কলেজ হোস্টেলে চলে গেল। ছোট ছেলেটাকে নিয়ে সুজাতা ও সমর শান্তি পেতে চাচ্ছে। সমর বলল,

– সুজাতা চল আমরা কলেজ কোয়ার্টারে গিয়ে থাকি। মা ছাড়া এ বাড়ি যেন শ্মশানপুরী মনে হচ্ছে। প্রতিরাতেই সমর মা-মা বলে চিৎকার করে কাঁদে। একদিন সুজাতা বড়মাকে বলল, 'বড়মা আপনাদের ছেলের আর সহ্য হয় না। কিছুদিনের জন্য এ বাড়ি ছেড়ে আমরা যদি আপনাদের ছেলেকে নিয়ে কলেজের কোয়ার্টারে গিয়ে থাকি তাহলে কেমন হয়।' বড়মাও তো শোকাহত তাই সে বলল, 'তোমরা যেখানে থেকে ভাল থাকবে, আমিও তাই চাই তোমরা সেখানেই থাক শান্তিতে থাক।' সুজাতা অনুনয়ের সঙ্গে বলল, 'বড়মা আপনাদের এ দুঃসময়ে ছেড়ে যেতে মন চাচ্ছে না। তবুও সুদীপ্তার বাবার জন্য অপ্রিয় কাজটা করতে হচ্ছে। এজন্য আমাদের মাফ করবেন বড় মা।'

– নারে মা, এত ভাবার কিছু নেই। কেউ তো আমার পর নয়, তোমরা যেমন প্রাণ দিয়ে এ বাড়ির সবাইকে ভালবাস, তেমনি আমরাও হৃদয় উজাড় করে তোমাদের ভালবাসি। তোমরা ভাল থাকলে, আমাদের সুখ, আমরা ভাল থাকলে তোমাদের আনন্দ তাই নয় কি? যেটা ভাল হয় সেটা কর না মা।

সবকিছু নিয়ে সুজাতা একদিন শুভদিন দেখে কলেজের কোয়ার্টারে গিয়ে উঠল। ওখানে সব গোছাতে সপ্তাহখানেক সময় লাগলো। কাজের মধ্যে থেকে ওরা আস্তে আস্তে শোক ভুলে যেতে লাগলো।

১৩শ অধ্যায়

বাড়ির এ অবস্থার মধ্যে সমরেশ মাঝে মাঝেই টাঙ্গাইল আসে। এবার টাঙ্গাইল এসে দেখে সমর তার বৌ ছেলে নিয়ে কলেজ কোয়ার্টারে উঠেছে। এতে অমরের খুব রাগ হলো। যে বাবা মা সমরকে কোনদিনও পর ভাবেনি নিজের ছেলের মত আগলে রেখে অপত্যস্নেহে মানুষ করে তুলেছে। সেই সমর বৃদ্ধ-মা-বাবাকে ফেলে রেখে কোয়ার্টারে গিয়ে উঠেছে। যার যার ভাবনা তার তার। অমর ভাবছে তার মা-বাবার কষ্টের কথা, আর সমর কিছুতেই বুঝতে পারছে না কি করে মায়ের শোক ভোলা যায়। তা তার কাজ সঠিক না বেঠিক সেটাও বুঝে উঠতে পারছে না। সুজাতা ভাবছে আর কয়েকটা দিন পার হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে কিন্তু একখানে এসে সবাই একই কথা ভাবছে, কবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সমর তো লেখাপড়া ছাড়া কিছুই বুঝে না, তাই ভগবান ওকে মনমত কাজই জুটিয়ে দিয়েছে। অমরের ইচ্ছা মা-বাবা ও সুজাতাকে নিয়ে ঢাকায় থাকবে আর সমরের ইচ্ছামত সে কলেজ নিয়ে সুখে থাকবে। অমরের কথামত সুজাতা তার পরম প্রিয় স্বামীকে ছেড়ে কিছুতেই থাকবে না। একা একা থেকে সমর অসুস্থ হয়ে পড়বে। সুজাতা অমরকে বলল, 'অমরদা তোমার বন্ধুর মন ও শরীর দুটোই ভাল নয়। তার যত্নের খুবই প্রয়োজন। আমি ছাড়া তার পূর্ণযত্ন কিছুতেই হবে না। ভাই তুমি ওকে বা আমাকে নিয়ে টানাটানি করো না। তবে এটা ঠিক কয়েকটা দিন গেলেই তোমার বন্ধু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। ধৈর্য ধর। আমি ও তোমার বন্ধু প্রায়ই টাঙ্গাইল যাই এবং আমি দু' তিন দিন থেকেও যাই। আমার কি ভাল লাগে বড়মাদের কষ্ট দেখে। আমি তো উনাদের নিজের বাবা-মা বলেই মনে করি। বড় মা নিজেও চায় না তার আদরের সন্তান সমরের কষ্ট হোক।'

– হয় তুমি টাঙ্গাইল গিয়ে বাবা-মার কাছে থাকো, নতুবা বাবা-মাকে ঢাকায় নিয়ে এসে আমার কাছে ঢাকায় থাকি।

– দু'টোর একটাও হবে না, সমর টাঙ্গাইলের বাড়ি থেকে একটুও শান্তি পাচ্ছিল না, সমর বারবার আবছাভাবে মাকে দেখে, মা যেখানেই শুতো সেখানে দেখে মা শুয়ে আছে। আবার দেখে মা সমরের পিঠে হাত দিয়ে আদর করছে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখে না কিছু নেই। তখনই মা-মা বলে চিৎকার করে উঠে।

– তাহলে মা-বাবাকে সুরুজ নিয়ে এসো।

– হ্যাঁ তা আসতে পারি। কিন্তু জ্যাঠাবাবু ও বড়মা দুজনের একজনও রাজী হবে না।

রাজী হবে না মানে কি? তাদের অনুরোধ করেছ?

– হ্যাঁ গো– হ্যাঁ, সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছে আমার স্বামীর মঙ্গলের জন্য।

– শুধু স্বামীর মঙ্গল করলেই হবে, দেওরের মঙ্গল করতে হবে না?

– দেওরের মঙ্গল করতে কতবার তোমাকে অনুরোধ করলাম, আমাদের বাড়ির পাশের মুখার্জি বাড়ির মেয়েটি একটিবার দেখো, দেখে যদি পছন্দ না হয় তাহলে ব্যবস্থা করবো। তুমি তো আমার কোন কথাই শুনলে না।

– কি শুনবো? তোমাকে ছাড়া আমার কিছুই ভাল লাগে না।

– দেখ অমরদা এরকম ইয়ার্কি আমার সঙ্গে আর করবে না। তা হলে কিন্তু ভাল হবে না। বলতে বলতে সুজাতা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পিছনে পিছনে অমর সুজাতাকে ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে বের হচ্ছে তখন সমরের সাথে অমরের ধাক্কা লাগলো। সমর বলল, 'উদ্ভ্রান্তের মত এমন করে সুজাতাকে ডাকছিস কেন? ও তো পালিয়ে যাচ্ছে না, বাড়িতেই আছে। আয় ঘরে এসে বোস, এখনই আসবে।'

– তবে ডাক, দেখি আসে কিনা।

– না ডাকলেও আসবে। সত্যি সত্যি সমরের কথার আওয়াজ পেয়ে সুজাতা এসে পড়েছে।

অমর আজকাল মা-বাবাকে দেখাশোনার জন্য প্রায় প্রায়ই টাঙ্গাইল আসে। অমরের ধারণা এ দুনিয়াতে কেউ কারও নয়। অন্যের বিপদে যতই মানুষকে সাহায্য কর না কেন, সে যদি পর হয় তাহলে পরই থাকবে। এ সমস্ত কথা সে সমরের সামনে বলে না। কিন্তু যার সামনে বলে সে সুজাতা? এতে ভারী কষ্ট পায়। আর একা একা কথাগুলো মনে করে ব্যথায় গুমরে গুমরে উঠে। আজকাল জ্যাঠাবাবুর শরীরটাও বেশি ভাল যাচ্ছে না, তাই যতীনবাবু বেলা ২ টার পর কোর্টে থাকে না, বাড়ি চলে আসে। সুজাতার ক্লাস না থাকলে অধিকাংশ দিনই সে ছেলেটার হাত ধরে একটা রিক্সা করে টাঙ্গাইল চলে আছে। জ্যাঠাবাবু–বড়মা দু'জনেই সুজাতাকে দেখে খুশি হয়। ঘরে ঢুকে কাপড়টা ছেড়ে সুজাতা রান্না ঘরে ঢুকে পড়ে। বড় মা পিছনে পিছনে আসতে আসতে বলতে থাকে, 'আমার মা এলো নাকি? ওমা মেয়েকে ছেলেকে আগে দেখো তারপর অন্যকথা।'

– বড় মা আসি, তোমরা কি খেলে দেখবো না। আমি আমার ছেলে মেয়েকে দেখতে পারছি না। তারা কেমন আছে দেখব না।

বড় মা সুজাতাকে কাছে টেনে নিয়ে এসে বলল, 'ওমা একি শরীর হয়েছে আমার মায়ের। এত খাটাখাটনি কি আর সহ্য হয়। সন্তান-স্বামী নিয়ে সংসার,

আবার কলেজ। মারে তোর শরীর ভাল না থাকলে আমাদের শরীরও ভাল থাকবে না। কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দে মা।'

– তাই দিবো ভাবছি। তোমার ছেলের শরীরটা একটু ভাল হোক। আতঙ্ক ভাবটা কেটে যাক। সুস্থ–স্বাভাবিক হলেই আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে থাকবো। জানো, তোমাদের জন্য আমার খুব পরাণ পুড়ে।

– তা আর জানি না, মায়ের প্রাণ যে, তোদের জন্য আমারও ভাল লাগে না।

– বড়মা আজ আর আমরা যাবো না। দেখ না দাদা-নাতির ভাব।

– যাবো না কিরে! সমরটাকে একলা রেখে তুই আমাদের কাছে থাকবি?

– না বড়মা কলেজের দুজন দারোয়ানকে থাকতে বলেছি ওদের খাবারও করে দিয়ে এসেছি।

আরতির মৃত্যুর পর শোকাহত পরিবারে প্রত্যেকের শরীর একটুও ভাল যাচ্ছে না। যতীনবাবুও বাড়িতে বসে থাকতে পারছে না। তাই প্রতিদিন কোর্টে একবার করে যাবেই। ওখানে গেলে বন্ধুবান্ধব ও অন্যদের সঙ্গে দেখা করে। বিভিন্ন বিষয় আলাপ আলোচনা করলে মনটা কিছুটা প্রফুল্ল থাকে। তাই যতীন বাবু একবার করে কোর্টে যাচ্ছে। এদিকে সুজাতা কলেজের নানা ছুটিতে টাঙ্গাইল চলে এসে বড় মা ও জ্যাঠার যত্ন নিচ্ছে। এভাবে কী জীবন চলে, তবুও চালাতে হবেই এবং সবার মুখে নতুন করে হাসি ফুটাতে হবে। সমর অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং কলেজের উন্নতির জন্য সে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। এ নিয়ে জ্যাঠা বাবুর সঙ্গে আলাপ করবে বলে একদিন টাঙ্গাইল এসে তার পরিকল্পনার কথা জ্যাঠাবাবুকে জানাল। সমরের গঠনমূলক পরিকল্পনা শুনে জ্যাঠাবাবু ভীষণ খুশি হলো। মনে মনে ভাবলো ছেলেটা আমার সত্যিই শোক কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সমরের কথাতে যতীনবাবু পূর্ণ সমর্থন দিল। সমর বলল, 'জ্যাঠাবাবু আমার ইচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটের পরই আমরা ডিগ্রি কলেজ খুলবো এবং আস্তে আস্তে কলেজের কলেবর বৃদ্ধি করবো। কলেজের দক্ষিণপার্শ্বে যে মাঠটা পড়ে রয়েছে রাস্তার ধারে ওখানটায় আমরা কলেজ হোস্টেল করবো। আর কলেজের উত্তরপাশে যে মাঠ ও খানিকটা ঝোপ জঙ্গল পড়ে আছে ভবিষ্যতে ঐ জায়গায় অনার্স ক্লাস করার জন্য অবকাঠামো বৃদ্ধি করা হবে। এ ব্যাপারে আমি নকশাও করে ফেলেছি। সবই দেখবে এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার প্রয়োজন মনে করলে সেটাও করবে। আর একটা কথা, অমরকে সঙ্গে রাখতে হবে। ওর মতামতের দাম দিতে হবে। জ্যাঠাবাবু সমরের কথাকে পূর্ণ সমর্থন দিল।

জ্যাঠাবাবু আগে কলেজ ও হোস্টেলের সমস্ত প্ল্যান দেখে সন্তুষ্ট হলো এবং অমরকে টাঙ্গাইল আসার জন্য ফোন করল। অমর হোস্টেল ও কলেজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দেখে ভীষণ সন্তুষ্ট হলো। বললো, 'সমর এটা তুই কি করেছিস, কিরে? আমিতো কল্পনাও করতে পারছি না। তবুও বলছি, নামকরা দু'তিন জন ইঞ্জিনিয়ারকে তোর সঙ্গে রাখিস তাহলে জিনিসটা আরও সুন্দর হবে। আমার মনে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়াররাও তোর পরিকল্পনার প্রশংসা করবে।' নিজের প্রশংসা কে না শুনতে চায়। সমর প্রশংসা শুনে জ্যাঠাবাবুকে প্রণাম করে বলল, 'জ্যাঠাবাবু আমরা যেন ভবিষ্যতে আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে সফল হতে পারি। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো।' জ্যাঠাবাবু বলল, 'তোমরা দু'ভাই মিলে আন্তরিকতার সাথে কাজ করলেই তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে এবং তোমরাও সফল হবে। অমর নিজের কাজে এত ব্যস্ত যে অন্যকাজে হাত দেওয়ার তার সময় নেই।'

অমর বলল, 'দেখ ভাই সমর, আমার উপর কখনও ভরসা করে থাকিস না। যদি কখনও কাজে বিশেষ জটিলতা দেখিস তখন আমার সাহায্য চাইতে পারিস। তাছাড়া তুই আমার চেয়ে অনেক বেশি পারদর্শী, বাবাও সেটা জানে। তুই যে এই প্রতিষ্ঠানকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারবি সে বিষয়ে বাবার অগাধ বিশ্বাস। বাবার মুখ উজ্জ্বল করার মত একজন ব্যক্তিই আছে। সে তুই। এটা আমারও বিশ্বাস। তুই নিশ্চিন্ত মনে কাজ চালিয়ে যা, টাকা-পয়সার কোন অভাব হবে না। বাবার যথেষ্ট টাকা আছে। মহৎকাজে টাকা ব্যয় করতে বাবা কখনও কার্পণ্যবোধ করে না। সুতরাং তুই প্রয়োজন অনুসারে কাজ করে যা। বাবার আকাঙ্ক্ষা যেন পূরণ হয়।'

কলেজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকালে পরিবারের সবাই উঠে পড়ে লেগেছে। যে পরিবারের সবাই জনগণ ও দেশের মঙ্গল চিন্তা করে তাদের প্রতিটি কাজেই সফলতা আসবে। সুদীপ্তার এবার এস.এস.সি. ফাইনাল পরীক্ষা। তাই ওর মায়ের ইচ্ছা ঢাকায় ওর কাকুর বাসায় রেখে ভাল শিক্ষকের এর কাছে টিউশন করালে মেয়ের রেজাল্ট আরও ভাল হবে। সুজাতা তার মনের ইচ্ছা সমরকে জানালো, সমরও চায় মেয়ের রেজাল্ট ভাল হোক। তাই সেও সুজাতার কথায় রাজী হলো। সুজাতা মেয়ের দেখাশুনা করার জন্য ঢাকায় অমরের বাসায় চলে এলো। সুজাতা ঢাকা যাওয়াতে সরলা ও যতীনবাবু যেন একটু স্বস্তি পেল। ছেলেটার একটু যত্ন হবে। চাকর-বাকররা যতই ভয় পেয়ে কাজ করে দিক না কেন, তাতে আন্তরিকতা থাকে না।

সন্ধ্যাবেলায় বাইরে থেকে এসে অমর ঘরের ভিতর বাচ্চা ছেলে ও মেয়েদের কথা শুনে কৌতূহলবশত ঘরে ঢুকে সুজাতাকে দেখে আনন্দে এক লাফে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল,

– এ মা সুজাতা, তুমি এসেছ, আমি তো ভাবতেই পারিনি। এতদিনে আমার বন্ধুপত্নী বুঝতে পেরেছে আমার দুঃখ, বেশ আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। সুদীপ্তা, সুদেব তোমার পূর্ণ পরিবার নিয়ে এসেছ। আরেকজন কই? আমার প্রিয় বন্ধু সমর আসেনি? এটা কেমন হলো পরিবারের আসল লোকটিই আসেনি।

– নাও এখন চুপ কর, চা-না-কফি কি খাবে বল?

– অনেকদিন হয় আমার আপনজনের হাতে তৈরি কফি খাই না, কফিই দাও।

– তুমি যে যে জিনিস খেতে ভালবাসো, তার মধ্যে চাল ভাজা, তিলের কটকটি, নাড়ু, ছানার সন্দেশ এখনই দিবো।

– এনেছ যখন তখন কি আর না খেয়ে থাকতে পারি। দাও– দাও। অমর খুশিতে পায়চারী করছে আর গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে চাদর গায়ে অন্য ঘরে চলে গেল। ও ঘরেই সুজাতা অমরের নাস্তা নিয়ে গেল। সুজাতা আমার যে কি ভাল লাগছে, তোমাদের বলে বলে আমি হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আর বলব না, দেখ, না চাইতেই বৃষ্টি এলো, আমার কি ভাগ্য।

– সুদীপ্তার সঙ্গে আলাপ করে, ওর টিউশন ঠিক করে দাও, যাতে তোমাদের মত তোমার ভাস্তিও ভাল রেজাল্ট করতে পারে।

– এখনই করতে হবে। নাকি পরে করলেও চলবে।

– এখনই মানে এই মুহূর্তেই নয়, কাল পরশুর মধ্যে করলেই হবে।

–যথা আজ্ঞা মহারানী, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

– অমররদা ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

– খারাপ কি? তোমার সাথে একটু আধটু ইয়ার্কিও করতে পারবো না। তা হলে কীসের সম্পর্ক। কীসের জীবন। থাক তুমি যা বলবে তাই হবে।

ছেলে-মেয়েরা এতক্ষণ খাচ্ছিল, তাই এখন এসে কাকুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সুদেব বলল, 'কাকু আমরা থাকতে এসেছি। মা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিবে। আবার দিদুর পরীক্ষার পর আমরা চলে যাবো।' কাকু বলল, 'কাকুর কাছে চিরদিনই থাকবে। আমি তোমাদের যেতেই দিবো না।' কাজের লোকদের ডেকে অমর বলে দিল কে কোন ঘরে থাকবে এবং ওদের সুবিধামত তার ব্যবস্থা করে দিতে। সুদীপ্তা বলল, 'আমরা সবাই এক রুমে থাকবো সেভাবেই সাজাবে।' কাকু বলল, 'সে কি সুদীপ্তা, তোর পরীক্ষা তোর নিরিবিলির জন্য একা একটা ঘরেরই খুব দরকার। এখন না বুঝলেও পরে বুঝবে।'

সুজাতার মন ঢাকায় কিছুতেই টিকতে চায় না, তাই দিনে দুতিনবার সমর ও বড়মাদের কাছে ফোন করে খবর নেয়, তাতে ওরাও কথাবার্তা বলে কিছুটা

নিশ্চিন্ত হয়। সুজাতা দু'চারদিনের জন্য টাঙ্গাইল যেয়ে জ্যাঠাবাবু ও বড়মাকে নিয়ে ঢাকায় আসে। সুজাতা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে খুব ভালবাসে। এখানে এসে বড়মারও খুব ভাল লাগে। কিন্তু কি করবে, বাড়ি ছেড়ে তো আর থাকা সম্ভব নয়। সর্বদাই ওদের জন্য মনটা কেমন করে।

মা-বাবা আসার পর থেকে অমর-বাইরে একটু কম বের হয়। জরুরী কাজে যেতেই হয়। অমর মা-বাবাকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। উনাদের দুজনের মধ্যে বসে বলল, 'আমার যে কি ভাল লাগছে, তা তোমাদের বলে বুঝাতে পারব না।'

– সংসারের ভিতরে থাকলে ভালই লাগে। মা উত্তর দিল।

–তাইতো বলি আজ কত ভাল লাগছে, তোমরা আছ, ওরা আছে।

– সেজন্যই তো বলতে বলতে অস্থির হচ্ছি, বিয়ে কর, বিয়ে কর।

– মা তুমি যে কি বল না, মায়ের সঙ্গে কি কারো তুলনা হয়, মায়ের বিকল্প কিছু নেই।

– সবই জানি, বাবা-মা কারও চিরকাল বেঁচে থাকে না। তারা চায়, তাদের সন্তান বিয়ে করে সুখে শান্তিতে সংসার করুক। সন্তানের সুখ-শান্তি দেখেই তাদের আনন্দ। এখন বুঝতে পারছিস না, কিন্তু যখন সংসার করবি তখন বুঝতে পারবি, মা-বাবারা কীসে শান্তি পায়। কীসে সুখ আসে। তোর বাবার একটাই তো আফসোস। আমার সব হলো। সব আশা পূরণ হলেও একটা আশা আমার ছেলে পূরণ করছে না। তোর বাবাকে সুখী করতে একমাত্র তুই পারিস। যাকগে আমি আর কিছু বলতে চাই না।

সবাই সুদীপ্তা ও সুদেবকে দেখার জন্য একবার করে হলেও ঢাকায় আসে। কিন্তু কাজ পাগল লোকটা সমর, ছেলে-মেয়েদের কথা মনে হলে বিশেষ করে রাত্রিতে সবারই অবসর সময় তখন ফোন করে। কলেজের কাজে যদি ঢাকায় আসে তবে কাজ সেরে ঐ পথ দিয়েই আবার চলে যায়। অযথা সময় নষ্ট করবে না বলে। সুজাতা মাঝে মাঝে রাগ করে স্বামীকে দু'চার কথা শুনিয়ে দেয়। শুনালে কি হবে তাতে সে কিছুই মনে করে না। স্ত্রীর কটাক্ষ কথাতেও কোন প্রতি উত্তর করে না। সুজাতাতো স্বামীর প্রশংসা করে বলে সমর একজন নির্বিবাদি লোক এবং শান্তিপ্রিয় লোক। এমন লোক বর্তমান যুগে খুব কমই দেখা যায়।

সুদীপ্তার এস.এস.সি. পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার দুদিন পূর্বেই সুদেবের জন্মদিন। অমরের ইচ্ছা ঘটা করে জন্মদিন করবে। সুজাতার ইচ্ছে কোন রকমে জন্মদিন পালন করবে। সমরেশও ফোন করে বলেছে। আমার মার যেন পরীক্ষায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে। সেদিকে সুজাতা ও অমরকে খেয়াল রাখতে

বলেছে। আবার সুদেব বায়না ধরেছে বড়ঠাম্মি ও দাদা না আসলে জন্মদিন পালন করা হবে না। কাজেই ছোট্ট বাচ্চাটার আবদার না রাখলে কেমন হয়। সুজাতা সবদিক বিবেচনা করে সমরকে বড়মা ও জ্যাঠাবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলল। এদের তিনজনের একজন যদি না আসে তাহলে ছেলেটি ভীষণ মন খারাপ করবে। যেমন করে পার সব কিছু ম্যানেজ করে আসার জন্য সমরকে অনুরোধ করল অমর।

সুদীপ্তার পরীক্ষা প্রায় শেষের দিকে। সুজাতা বলল, 'তোমরা প্রস্তুত থেকো পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে তার পরের দিনই আমরা রওনা হবো।' সুদীপ্তা বলল, পরীক্ষা শেষ হলেই চলে যাবো। ভেবেছিলাম একটু ঘুরাঘুরি করব, বেড়াবো। কাকুও তো তাই বলল। সুজাতা বলল, 'তাহলে থেকেই যাও, সারাজীবন আর বেড়াতে হবে না। এদিকে তোমার বাবার কি অবস্থা, সেটা দেখবে না।'

– বাবার আবার কি অবস্থা? বাবা ভালই আছে। সকাল বেলায় বাবার সঙ্গে কথা হলো। কই বাবা তো কিছু বলল না।

– তোমার বাবার খাওয়া-দাওয়ায় এত অসুবিধা হচ্ছে। উনি তো তা মুখ ফুটে বলবে না। দারোয়ানরা কি রাঁধতে জানে? ওরা কোন রকম রান্না করে দিবে। আর তোমার বাবা মুখে ভাল না লাগলেও কিছু বলবে না। খেতে ভাল না লাগলে কিছু না বলে খাওয়া রেখে উঠে যাবে। তোমার বাবাকে আমি জানি না, তার প্রতিটি লোমকূপের খবর আমার জানা।

অমর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'যতই তোমার জানা থাকুক না কেন সমরের মত ছেলেই হয় না, যাক মেয়েটা বায়না ধরেছে ওকে না করো না। কটা দিন থেকে যাক। সমরও না করবে না, খুশি হবে।'

– তাতো হবেই, বড় মা-জ্যাঠাবাবু তাদেরও তো অযত্ন হচ্ছে। ওটাও তো আমাদের দেখা উচিত। তা না করে দেশের কাজ নিয়ে তুমি ব্যস্ত। মা-বাবার যা হবার হোক।

– সুজাতা বেশি কথা কিন্তু বলে যাচ্ছো।

– বেশ করেছি। এখানে বলার জন্য তো একমাত্র আমিই আছি।

১৪শ অধ্যায়

পড়ন্ত বেলায় গোধূলি লগ্নে সুজাতা ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলো। মেয়েটা বায়না ধরেছিল। সে বায়না রক্ষা করার জন্য অমর সমরকে টেলিফোন করেছিল। বাচ্চাদের আবদার যেন সুজাতা রক্ষা করে। সমরও চায় বাচ্চাদের সর্বদা সন্তুষ্ট রাখতে। তাই ওদের বাড়ি ফিরতে দু'দিন দেরী হলো। সুজাতা ফোনে বলে দিয়েছিল সোমবার বিকেলে এখান থেকে রওনা দিবে। সেই অনুযায়ী সমর কলেজ ছুটির পরই সুরুজ থেকে টাঙ্গাইল চলে এসেছে। বাইরের ঘরের জানালা খুলে সমর লক্ষ্য করছিল গাড়ি আসছে কিনা। খানিক পর ফোন করে সুজাতার কাছে জানতে চাইল তারা এখন কোথায়?

– আমরা এখন চৌরাস্তায়

– ওরে বাবা সেতো অনেক দূর।

– থাক দূর, তুমি বড়মা ও জ্যাঠাবাবুর সঙ্গে আলাপ করে সময় কাটাও। সুদীপ্তা বলে উঠল, ও মা জলের বোতল আনোনি?

– তুমি আনতে পারোনি? অকর্মার হাঁড়ি। প্রয়োজনে কাজ শিখতে হয় সারাজীবন তো আর মা থাকবে না।

– পরে কাজ শিখব মা, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।

সুজাতা ড্রাইভার রহমত আলীকে ডেকে বলল, 'রহমত ভাই, জলের দোকান থেকে এক বোতল জল নিয়ে আসুন।' ড্রাইভার সাহেব রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এক বোতন জল এনে দিয়ে বলল, 'কাকু তোমরা কিছু খাবে কি?'

সুজাতা ড্রাইভারকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, 'ওরা মাত্র খেয়ে এসেছে ওদের কিছু খেতে হবে না।'

– ভাবি, বাচ্চা মানুষ কি তেমন আর খাবে, বল বল কাকু কী চাই।

– আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। ওরা আপনাকে জ্বালায়, আজ মা আছে তাই জ্বালাতে পারছে না। ওর বাবা ওদের পথপানে চেয়ে আছে। চলুন চলুন।

সমর সুদীপ্তাদের পথ চেয়ে দারোয়ানের কুটীরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। খানিক পরে সমর শুনতে পেল গাড়ির আওয়াজ এবং তার একটু পরেই দেখতে পেল সারা মাঠ গাড়ির আলোকে আলোকিত। সমর এগিয়ে যেতেই সুজাতা গাড়ি থেকে নেমে সমরের হাত ধরল। বলল, 'চল, বাড়ির ভিতরে চলো।'

– ওদের নিবে না?

–হ্যাঁ, নিবোই তো। ড্রাইভার সাহেব, আপনি গাড়ি বাড়ির ভিতরে নিয়ে যান, ওখানে ওদের দাদা-ঠাম্মি অপেক্ষা করছে।

ড্রাইভার সাহেব গাড়ি নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল দাদা-ঠাম্মি নাতি-নাতনি দেখে বলল, কিরে তোদের মা আসেনি।

– নাগো ঠাম্মা মা কয়দিন পরে আসবে। সুদীপ্তা হেসে হেসে বলল। ঠাম্মি গেটের দিকে তাকাতেই দেখল যুগলে কথা বলতে বলতে ধীরপদে এগিয়ে আসছে।

– ও দুষ্টু মেয়ে আমাকে ক্ষ্যাপাচ্ছিলে? আমি কি তোর ইয়ার্কির পাত্র? দাঁড়া আমিও মজা দেখাব।

সুজাতা মা এসো এসো বলে বড়মা তার বৌমাকে ঘরে নিয়ে গেল। সুদেব ঠাম্মির আঁচল ধরে টানতে টানতে বলল, মেয়েকে মা-মা বলে আদর করে ঘরে নিয়ে যাচ্ছ, আর আমাদের নিবে না? আমরা উঠোনে থাকবো নাকি? ও দাদা দেখ না ঠাম্মির ব্যবহার।

দাদা এসে নাতির হাত ধরে বলল, 'সত্যিই তো এক যাত্রায় পৃথক ফল, এটা মোটেই ঠিক নয়, এসো দাদাভাই আমি তোমার হাত ধরে আদর করে ঘরে নেব।'

– না আমি যাবো না যাবো না যাবো না।

– কেন ভাই? কেন যাবে না?

– ঠাম্মি এসে তোমরা দু'জনে আমার হাত ধরে নিয়ে যাও।

দাদা বলল, তাই নাকি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাই হবে।

আমার দাদুকে কোলে করে নিয়ে যেতে হবে। কই গো, এসো আমরা দুজনে দাদুকে ঘরে নিয়ে যাই।

দাদা আর ঠাম্মি মিলে নাতি সুদেবকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল। যতীনবাবু বলল, 'দেখলে একটু সময়ের মধ্যে বাড়িটা কেমন সরবও হয়ে উঠেছে। তাই তো বলি, এরা হচ্ছে ফুল। এদের নিয়েই আমার সবুজ সতেজ ও সুবাসপূর্ণ ফুলের বাগান। আজ কেমন লাগছে তোমার? মা সুজাতা একটু বিশ্রাম নিয়ে আমার কাছে এসো তো মা, রাতের খাবারের মেনু তৈরি করতে হবে। কতদিন পর আমার বাড়ি আজ ভরে উঠেছে। সমর কই সমর এদিকে আয় বাবা। বলতো বাবা আজ তোর কেমন লাগছে?

সেই তোদের ছোটবেলায় যখন আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতাম তখন আমাদের সংসারে কত সুখ কত শান্তি ছিল। আবার আমরা সেই সুখ-শান্তি ফিরে পেতে পারি না। সমর জ্যাঠাবাবুকে ধরে নিয়ে বলল, জ্যাঠাবাবু সব হবে। আমিও তো তোমার মতই সুখ-শান্তির কাঙাল। কি করতে হবে বল?

– তুই এখান থেকে কলেজে যাবি। কোয়ার্টারে থাকতে হবে না।

– ঠিক আছে, অমর কি করবে? কি করে ওকে কাছে পাওয়া যাবে।

সে কি রাজনীতি ছাড়বে, মন্ত্রীত্ব কি ছেড়ে দিয়ে সাধারণ জীবন যাপন করতে পারবে? কখনো তা পারবে না। ওকে ছাড়া তো সুখ-শান্তি কল্পনাই করা যায় না। অমরতো আমাদের জীবনের একটা অংশ।

ড্রাইভার সাহেব ওদের নামিয়ে দিয়ে তখনই ঢাকা ফিরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু যতীনবাবু অনুরোধ করে তাকে রেখে দিল এবং অমরকে ফোনে জানিয়ে দিল ড্রাইভার রহমত আলীকে আজ না পাঠিয়ে কাল সকালে পাঠানো হবে। চিন্তা করো না। পরের দিন জ্যাঠাবাবু, বড়মা, নিজের মেয়েকে নিয়ে সুজাতা সংসার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর বসল। সুজাতার ইচ্ছে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকবে, যেটাকে বলে পূর্ণ সংসার। সুজাতা বিয়ের আগে পূর্ণ সংসার পায়নি কিন্তু এখানে এসে পূর্ণসংসার দেখতে পেয়েছে এবং সেখানে সুখ ও শান্তি অনুভব করেছে। মায়ের মৃত্যুর পর সংসারটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। তাই তার ইচ্ছে আমরা সবাই মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করলে আবার হারানো সুখ ও শান্তি ফিরে পাবো। এ বিষয়ে সবার মতামত সুজাতা জানতে চাইল। বিশেষ করে স্বামী সমরের মতামতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিল।

জ্যাঠাবাবু ও বড়মা বলল, তুমি মা যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছ তাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। কন্যা সুদীপ্তা বলল, 'আগে তোমাদের সংসার কেমন ছিল সঠিক কিছু আমি জানিনা, তবে বর্তমান দেখে মনে হয় এর চেয়ে আনন্দঘন একটা সংসার ছিল এবং দাদা ছিল একমাত্র কর্তা। তার কর্তৃত্বেই সুন্দর সুখের একটা সংসার পরিচালিত হয়েছে।' আমরাও সুখ ও শান্তিই চাই। সুজাতা বলল,

– এবার তোমার মতামত বল, তুমি কি চাও।

– ভালো তো সবাই চাইবে, আগে তুমি বল কীভাবে সেই সুন্দরের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

– আমার পথ একটাই, আমরা সবাই সুখে-দুঃখে আনন্দে-বিষাদে, হাসি-কান্নায় একসঙ্গে থাকবো এবং একে অপরের পরিপূরক হবো। তাতে একজন ঢাকা, একজন ময়মনসিংহ, একজন কিশোরগঞ্জ, একজন সুরুজ এরূপ খণ্ড খণ্ডভাবে থাকা যাবে না। এখন তোমরা বুঝে দেখো, কীভাবে কাজ করলে আমরা মুশকিল থেকে উদ্ধার পেয়ে সুন্দরের পথে চলতে পারবো।

সমর বললো, 'এ তো দেখছি তুমি আমাকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলছ।'

– না- না আমি কাউকে উদ্দেশ্য করে বলিনি। সবাইকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে।

জ্যাঠাবাবু বলল, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অসুবিধা থাকেই, সেটাকে মানিয়ে সবার সুখের কথা চিন্তা করে, নিজের সুখটা ছেড়ে মুক্ত মনে চললে অনেকটা শান্তি ফিরে আসবে। বল সমর তোমার অসুবিধা।

– আমার অসুবিধা এটাই আমি যদি টাঙ্গাইল থেকে কলেজ করি, তাহলে কিছু সময় নষ্ট হবে, যার জন্য সব কাজ ঠিকমত হবে না। আমি কলেজ কোয়ার্টারে থাকলে ক্লাস বসার আগেই উপস্থিত হই। এটা কাছের লোকেরা জেনে তারাও আগেই আসবে। বিভিন্ন কাজে কলেজে না পেয়ে পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এমনও হয়েছে যে কাজ এক সপ্তাহ আগে হওয়ার কথা ছিল তা দেরীতে করতে হয়েছে। জ্যাঠাবাবু বলল, বাবা অনেক কলেজ আছে যাদের কোয়ার্টার নেই এবং তৈরী করার সামর্থ্য নেই। যাতায়াত ব্যবস্থাও তত ভালো নয়। সেই সমস্ত প্রিন্সিপালরা কি করবে। তারা কিন্তু পায়ে হেঁটে যথা সময়ে কলেজে উপস্থিত হয়ে ঠিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সব কিছু নির্ভর করে নিজের একাগ্রতার উপর। তুমি যদি চাও তোমার যদি একটি কাজ সুচারুরূপে করার ইচ্ছে থাকে তাহলে তোমার নিজের চেষ্টাতেই তুমি সফল হবে। আমি জানি তুমি পারবে তুমি ফাঁকিবাজ ছেলে নও। তোমার ঐকান্তিক চেষ্টা আছে। তুমি অন্যের উপর নির্ভরশীল নও। নিজে যথেষ্ট স্বাবলম্বী। সুতরাং তোমাকে দিয়েই সম্ভব, আমরা সংগঠনমূলক আলোচনাই আজ করেছি। তোমরা কীভাবে কি করবে আমাকে বিস্তারিত জানাবে, তারপর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো যে সমরেশ ভট্টাচার্য প্রিন্সিপাল হিসাবে কলেজের কোয়ার্টারে না থেকে টাঙ্গাইল থেকে প্রতিদিন কলেজে যাবে। এই ব্যবস্থা অন্তত সুদীপ্তার রেজাল্ট বের হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। পরবর্তী ব্যবস্থা কার্যকরী ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সুদেবকে আপাতত স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে। অমর কি করবে কি না করবে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হলো না। একজন মন্ত্রীর কত কাজ। তার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। সেখানে কি ক্ষুদ্র সংসারের চিন্তা করা মানায়।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়ার সাতদিন পর অমর টাঙ্গাইল এলো। এসেই দেখে সমর টাঙ্গাইল থেকেই নিয়মিত কলেজে যাতায়াত করে। এটা দেখে মন্ত্রী সাহেবের যেন কেমন মনে হলো। অমর সমরকে ডেকে বলল,

– এ কি রে সমর, তুই বাড়ি থেকেই কলেজ করছিস।

– হু, তাই কি হয়েছে?

– কি আবার হবে? বলতো এটা কার বুদ্ধি?

– তুই কি বলতে চাস স্পষ্ট করে বলতো? বড়মা, জ্যাঠাবাবু, সুজাতা ও আমি সবাই মিলেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

– বাঃ বাঃ সবাই মিলে- সেখানে আমি কই? আমার অস্তিত্ব এ বাড়িতে নেই।

– তুই কি বলছিস। বড়মা আর জ্যাঠাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদি ভুল হয়ে থাকে তবুও সেটা দু'মাস পরীক্ষামূলকভাবে দেখা হবে। জ্যাঠাবাবু এতে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। সুজাতা, সুদীপ্তা, বড়মা এতে মতামত দিয়েছে। জ্যাঠাবাবুর নির্দেশমত আমরা চলছি।

– জ্যাঠা বাবুর দোহাই দিয়ে চলতে হবে না। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি সুজাতার তা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। সে কি এ বাড়ির কর্তা যে তাকে সাংসারিক বিষয়ে কর্তৃত্ব করতে হবে।

– এই সুজাতা এ সংসারের কর্তাও নয় কর্তৃত্বও করেনি, তাহলে কি হবে। সে তো এ সংসারের একজন সদস্য সেজন্য সে মতামত দিতেই পারে। সমরকে এই প্রথম দেখা গেলো, বউয়ের পক্ষ নিয়ে বন্ধুকে কিছু বলতে। অমর বলল, 'সমর বেশ তো শিখেছিস, আগে তো এমন দেখিনি। আরও কত কিছু যে দেখবো।'

জ্যাঠাবাবু এসে সমরকে বলল, 'চুপ কর বাবা, তোরা তো কোনদিন ঝগড়াঝাটি করিসনি, আজ একি করছিস? বাবা অমর কার সঙ্গে ঝগড়া করছিস, সমর তোর ভাই, অন্তরঙ্গ বন্ধু, হরিহর-আত্মা, চুপ কর বাবা। আর সুজাতার কি দোষ? সে তো সংসারের ভালোর জন্যই করেছে। আমাদের মঙ্গলের জন্য করেছে। সবাই একসাথে থাকলে তোর অসুবিধাটা কোথায়? বল আমায়?' সুজাতাকে দোষারোপ করায় সুজাতা খুব অপমানিত হয়ে কাঁদতে লাগলো। তখন অমর আরও রাগ করে বলল, 'তোমাদের মেয়েদের তো একটাই অস্ত্র। কান্না দিয়েই পুরুষের মনটা ঘায়েল করবে। আমার যে বন্ধু কোনোদিনও আমার বিপক্ষে কথা বলেনি, সেও নারীর প্ররোচনায় আমার কথার প্রতিউত্তর দিল। একথা শুনে সুজাতা জোরে জোরে কেঁদে বলল, 'বড়মা, ও বড়মা তুমি শুনতে পারছো। আমাকে হেনস্তা করার জন্য কেমন করে বলছে। মাগো আমার কপালে এও ছিল?' মায়ের কান্না দেখে সুদীপ্তা ও সুদেব মায়ের কাছে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। যা কোনোদিনও এ পরিবারে ঘটেনি আজ তাই ঘটলো। সুজাতা ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো। বড়মাও তার ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগলো। অমর বলতে লাগলো, 'ন্যাকামো আর ভালো লাগে না। আর আসবোই না টাঙ্গাইলে।' পরেরদিন ফুরফুরে রৌদ্রস্নাত সকালে সুজাতা আনন্দোচ্ছল দিন কামনা করে সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো। বড়মা মনে মনে খুব ভয় পেয়েছিল আজকের দিনটা কেমন যাবে। বড়মা একটা ঘোলাটে অন্ধকার দিনের মুখ দেখবে বলে দুরুদুরু বুকে খাবার ঘরের দিকে গেলো।

গিয়েই অবাক হয়ে গেল, এত পরিপাটি করে খাবার দিয়ে খাবারের টেবিল সাজানো হয়েছে। বড়মা বুঝতে পেরেছে কার কাজ এটা। তবু আরও একটু ভালো করে জানার জন্য সে রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে গিয়ে দেখে সব পরিষ্কার হয়েছে।

বড় মা অমর ও সমরের নাম ধরে খেতে যাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করলো, ওরা ভেবেছে সরলাই সকালের নাস্তা তৈরী করেছে। ওরা দুজনেই দৌড়ে এসে বলল, কি হয়েছে গো এত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছো কেন?

– কেন আবার কি, খাবি না তাই খেতে ডাকছি। অমর তুই বলেছিস না আজ ঢাকা যাবি, সমর বলেছিল সে কলেজে যাবে তাই সকালের খাবার তৈরী। বোস, তোরা বোস, আমি খেতে দিচ্ছি।

খেতে খেতে সমর বলল, 'বড়মা এ রান্নাতো তুমি করনি।'

'তবে কে করেছে?' অমর প্রশ্ন করলো।

– সে আবার কে? সে তো আমার মা সুজাতা। এমন মেয়ে আর কোথায় পাওয়া যাবে। কাল রাতে কান্নাকাটি করে রাগ করে ঘরে খিল লাগালো। আর সকালে সকল অশান্তি ঝেড়ে দিয়ে শান্তির আশায় সবাইকে শান্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই না হলে কি আমার মা। মায়ের এ কথা শুনে অমর ও সমর দুজনেই মাথা নিচু করে মিটিমিটি হেসে খেতে লাগলো। এমন সময় সুজাতা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো তোমাদের আরও কিছু লাগবে কি?

– যা খাওয়ালে তা ঢের পুষ্টিকর। এবার ঢাকায় যাচ্ছি শান্তি খুঁজতে।

সুজাতা বড়মা ও জ্যাঠাবাবুর সকালের খাবার ও চা নিয়ে উনাদের ঘরে গেলো। জ্যাঠাবাবু সুজাতাকে বললো, মা তুমি নাকি সকাল বেলাতেই ফাটাফাটি করে দিয়েছো। এতো সুন্দর নাস্তা পরিবেশন করে দু'বন্ধুর রাগ একেবারে জল করে দিয়েছো? এমনটাই তো আমি তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলাম।

– জ্যাঠাবাবু আমি একটু পরে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করব। সুদীপ্তার বাবাকে একটু গুছিয়ে দেই, তারপর আসি বলে সুজাতা এ ঘর থেকে চলে গেলো।

সন্ধ্যার দিকে সমর কলেজ থেকে ফিরে আসার সাথে সাথে সুদেব বাবাকে ময়লা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। সুজাতা দৌড়ে এসে বলল, 'এটা তুমি কি করলে দেব, বাবা মাত্র এলো, হাত পা ধুয়ে নিক, তারপর তোমার আদর আহ্লাদ সোহাগ যা খুশি তাই করো।' সরলা এগিয়ে এসে বলল, 'এটাই তো তুমি চেয়েছিলে। এক সঙ্গে থাকার এটাইতো মজা। ছেলে-মেয়েরা বাবাকে ঘিরে দাঁড়াবে। তুমি বিকেলের টিফিন বানিয়ে দিবে ওরা একসঙ্গে বসে খাবে,

সন্তানের মুখে বাবা খাবার তুলে দিবে, সন্তান বাবাকে খাইয়ে দিবে। এতেই তো সবার আনন্দ, এগুলো আমার কাছেও তো আনন্দদায়ক।'

সুজাতা জ্যাঠাবাবুকে বিকেলের খাবারের সঙ্গে চা দিয়ে বসিয়ে দিলো। সবাই এক সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছে, আর চা খাচ্ছে। এটাইতো সুখি পরিবারের লক্ষণ। সুজাতাকে বাড়ির ঝি চাকরসহ সবাই ভালোবাসে। শুধু অমর যে কীভাবে কি বুঝে তা কী সেই জানে। মন্ত্রী মানুষ তিনি কি অন্যের কথামত চলতে পারে। নিজস্ব মতবাদকেই বেশি করে সে প্রাধান্য দেয়, সুজাতা সবার সঙ্গেই ভালো ব্যবহার করে থাকতে চায়। তাতে সবার মধ্যে যাতে সদ্ভাব বিরাজ করে।

রাত্রিবেলায় সুজাতা শোয়ার জন্য বিছানা পাতছে তখন সরলা এসে বললো, 'দাদু, দেব দাদু এসো, আমার কাছে শুবে না।' সুদেব শুয়ে পড়েছিলো, লাফ দিয়ে উঠে বললো, হ্যাঁ- হ্যাঁ, শুবোইতো চল বড় ঠাম্মি। সুজাতা বড়মাকে বললো, 'তুমি আবার ওকে নিয়ে যাচ্ছ কেন? রাতে তোমাদের ঘুমোতে দিবে না, বিরক্ত করবে।' বড়মা বললো, 'সে কি করে কীসের বিরক্ত?'

– যেমন ধর, প্রস্রাব করবে সেজন্য উঠতে হবে। জল পিপাসা লাগবে। আবার পিঠ চুলকিয়ে দাও। এমন নানা বায়না ধরে তোমাদের ঘুম নষ্ট করবে।

– নষ্ট করে করবে, মায়েরা কখনও বিরক্ত হয় না। তুমি না মা, তুমি কি কখনও বাচ্চাদের আবদারে বিরক্ত হও। নাও এখন দরজা দিয়ে শুয়ে পড়।

রাতে শুয়ে সমরের মাথায় চুল বিলি কাটতে কাটতে সুজাতা বললো, 'আচ্ছা তুমি সত্যি করে বলতো অমরদা কি ছোটবেলা থেকেই এরকম, নাকি নানা কাজের চাপে কখনও কখনও আবোলতাবোল বলে?'

– না গো না, অমর কিন্তু সহ্য ও ধৈর্যশীল। আর ব্যবহারটাও ভালো। আমাকে এতো ভালোবাসে যে ছোটবেলা থেকে কেউ আমাকে কিছু বলতে পারেনি। সেই সুবাদে তো তোমাকেও খুব ভালোবাসে।

– তা জানি। কিন্তু মাঝে মাঝে যে অপ্রীতিকর কথা বলে, তাতে ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি বলে কিছু থাকে না।

– তুমি অযথা ওকে ভুল বুঝছ। অমরের মত সরল মনের লোক খুব কমই পাওয়া যায়। এগুলো তোমাকে ইয়ার্কি করে বলে।

– তুমি এতো ভালো? তুমি বেশি ভালো। বেশি ভালো লোকদেরই মানুষ ঠকায়। শেষ জীবনে তাদের জীবন দুঃখে কাটে।

– নাও ঘুমিয়ে পড়।

১৫শ অধ্যায়

যতীনবাবুর ইচ্ছে গ্রীষ্মের বন্ধে কোথাও গিয়ে ঘুরে আসার। সমরের ইচ্ছা আমাদের সাথে অমরও যাক। ওকে বাদ দিয়ে আজ পর্যন্ত কোথাও যায়নি। এখন বাদ দেওয়া কেমন দৃষ্টিকটু লাগে। তাই অমরকে বাড়ি আসতে বলল। সমর তার মনের ইচ্ছা জ্যাঠাবাবুকে জানাতে উনি খুশি হয়ে সম্মতি জানালো। বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে সমর বললো, চল অমর আমরা সবাই মিলে কোথাও ঘুরে আসি। অমর বললো, যেতে চাও যাবে, যেখানে খুশি যাও ইচ্ছামত যাও কিন্তু সুজাতা আমার সঙ্গে থাকবে। কথাটা শুনে সুজাতা বললো, 'দেখলে দেখলে কথা বলার ঢং। আমি কোথাও যাবো না।' অমর সরে এসে সুজাতার কাছে এসে বললো, 'তাহলে আমিও যাবো না। তুমি যেখানে আমিও সেখানে।' সুজাতা ওখান থেকে উঠে রান্না ঘরের দিকে চলে গেলো। সরলা সুজাতাকে পালিয়ে যেতে দেখে অমরকে বললো, 'আবার তুই ওর পিছে লেগেছিস। মেয়েটাকে কি একটুও শান্তিতে থাকতে দিবি না?'

– আমি কি করেছি মা, তুমি কি আমাকে একটুও শান্তিতে থাকতে দিবে না।

– আমিতো শান্তিতেই থাকতে চাই, শোন চল আমাদের সঙ্গে। সবাই এক সঙ্গে বেড়াতে গেলে তার আনন্দই আলাদা। তাছাড়া এবার আমরা যেতে পারছি। পরে হয়তো আর নাও যেতে পারি, আস্তে আস্তে বয়স বাড়ছে তো তখন কি আর আজকের মত চলাফেরা করতে পারবো না। বৃদ্ধ মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ালে খুবই আনন্দ পাওয়া যায়। অমত করিস না বাবা, যাওয়ার দিন ঠিক করে চল শুভদিন দেখে ভগবানের নাম করে রওনা দেই।

– তাহলে তাই হোক। মায়ের আদেশ কি অমান্য করা উচিত। চলো তোমার আদেশই শিরোধার্য।

সমর অমরের হাত ধরে করমর্দন করে বললো, 'অমর খুব ভালো করেছিস। বড়মা তো সংসারের চার দেয়ালের বাইরে অন্য কোথাও যায়নি। একটু ঘুরে আসুক মনটাও ভালো লাগবে, শরীরটাও ভালো হবে। বড়মা ভালো হয়নি?' সুজাতা বললো, 'ভালো হয়নি মানে? খুবই ভালো হয়েছে?'

একসঙ্গে সবাই মিলে আজ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া হয়নি, এ বেড়ানোর আনন্দই আলাদা তাই না দীপা। দীপা লাফিয়ে হাততালি দিয়ে বললো, ভালো মানে, অত্যধিক ভালো। এই প্রথম আমরা বড় ঠাম্মিকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। সরলা বলল, তোমরা খুশি হলেই আমার আনন্দ। সুজাতা মা আছে বলে আমি যেতে রাজি হয়েছি। এখন তোমরা বলো কোথায় যাবে?

সুজাতা বললো, 'বড়মা সেটা তুমিই ঠিক কর।'

– আমি না, এটা ঠিক করুক আমার দিদুভাই দীপা।

– তোমরা আমাকে এতো মূল্য দিচ্ছ, আমার ইচ্ছার দাম দিচ্ছ, বললো সুদীপ্তা। সমর বললো, 'তোমাকে দাম দিবে না, তোমরা দুজনেই তো আমার ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এরপর তো তোমাদের ইচ্ছামত আমাদের চলতে হবে। বল বল, কোথায় যেতে চাও?'

সুদীপ্তা খুশিতে টগবগ হয়ে বললো, 'রাখবে তো আমার কথা?'

সমর বললো, 'আমার মায়ের কথা কি ফেলে দেওয়া যায়?'

– তাহলে শোন, আমরা কক্সবাজার যাবো। সবাই হাততালি দিয়ে উঠে বললো, 'গুড আইডিয়া।'

সুজাতা এখানে আবার একটু যোগ করলো, কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে আমরা নারায়ণগঞ্জের বারুদিতে লোকনাথ বাবার আশ্রমে যাবো। তোমাদের মত থাকলে বলো? অমর বললো, 'আমার যথেষ্ট মত আছে। মাকে নিয়ে যাচ্ছি তীর্থে এর চেয়ে পুণ্যকাজ কি আর করতে পারি। শুধু মা নয় বাবাও সঙ্গে আছে।'

এ বাড়িতে এই প্রথম সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে সুদীপ্তা। সুজাতা মেয়েকে বললো,

– শুধু আনন্দ করলেই হবে না, যার যার প্রয়োজনীয় জিনিস সে সে গোছগাছ করে নিবে। ওখানে গিয়ে বলতে পারবে না, মা এটা কই, সেটা কই? যার যার ব্যাগ আলাদা হবে একজনের ব্যাগে আরেকজনের জিনিসপত্র রাখা যাবে না। আর যার যার ব্যাগ তার তার দখলে থাকবে। মা আমার জামাটা কই? বের করে দাও, এগুলো বলতে পারবে না।

– আচ্ছা বাবা, তাই হবে। ভাইয়ের বেলায় কি করবে?

– তোমার ভাই তুমিই দেখবে। ছোট ভাইয়ের দেখভাল করার দায়িত্ব তোমার। একটু স্বাবলম্বী হও। চিরকাল মা তো থাকবে না, সেটা ভেবে কাজ করতে হবে।

– ও মা তুমি অমন করে বলো না। এগুলো কথা বলে কি মায়েরা আনন্দ পায়, ওমা আর অলক্ষুণে কথা বলো না। একথা বলে সুদীপ্তা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলো।

– না, রাখ ওসব। আহ্লাদ দেখাতে হবে না। বড় হও, মা হও তখন বুঝবে কোনটা করা উচিত, আর কোনটা উচিত নয়।

– আমার মা আমার কাছে চিরকালই থাকবে। বল মা এমন কথা আর কখনও বলবে না, বল মা বল।

– ঠিক আছে বলবো না। তোমার মা অমর হয়ে থাকবে। সে মৃত্যুঞ্জয়ী। এখন শান্তি পেলে তো?

– হ্যাঁ মা, খুব শান্তি পেলাম, ওমা ভাইয়ের জামা কাপড় কোন ব্যাগে ভরবো সেটা দেখিয়ে দাও।

– হ্যাঁ সেটা দেখাবো, আর এটাও দেখাবো, কোন কোন জামা কাপড় ও কি কি জিনিস ভাইয়ের জন্য নিতে হবে। রেখে দাও, যেহেতু এখনও মা আছে মা-ই করে দিবে।

মন্ত্রী সাহেব তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে সমুদ্রের হাওয়া খেতে যাবে। সে তো পদাধিকার বলে সুবিধা পাবেই। না চাইতে তার সব সুবিধা হাতের কাছে এসে পরবে। অমর দুটো গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। সুজাতা বলল, দুটো দিয়ে কি হবে, যে কয়জন লোক তাতে একটা গাড়িতেই হয়ে যাবে। সমর বলল, হ্যাঁ তোমার কথা মতো, মন্ত্রী যাবে তার বাবা-মা ও দাদা বৌদি, ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেড়াতে, একটু আরাম-আয়েস করে যাবে না। এতে আপত্তি করার কি আছে। শুধু কি মানুষ যাবে, অন্যান্য জিনিসও তো নিতে হবে, অমর বলল,

– তুই ঠিক বলেছিস, বাবা-মাকে নিয়ে সমর নতুন গাড়িটায় যাবি, আর বাচ্চা ও মাসসহ আমি কালো পুরোনো গাড়িটায় যাবো। কি বল দেব? দেব বললো, তাই হবে। তাই হবে। আমি কাকুর কোলে করে যাবো।

– গাড়িতে এমনিতেই অনেক জায়গা থাকবে, তুমি ইচ্ছে করলে কোলে উঠেও যেতে পার।

সুজাতা বললো- অমরদা তোমার বন্ধু কি জ্যাঠাবাবু ও বড়মার যত্ন নিতে পারবে? বুড়ো-বুড়ির জল পিপাসা লাগতে পারে, কিছু খেতে ইচ্ছে হতে পারে। তার চেয়ে আমি বড়মার সঙ্গে ঐ গাড়িতে যাই। তোমার বন্ধু এ গাড়িতে থাকুক।

– সুজাতা তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। বাবা-মা কি এতই বুড়ো হয়েছে যে কোন কাজই করতে পারবে না। এখন উনাদের নড়াচড়া করতে না দিলে আরও অথর্ব হয়ে পড়বে। তখন... তখন কি করবে বলো?

– কিছুই হবে না। উনাদের যথেষ্ট মনের জোর আছে।

– আচ্ছা যদি অসুবিধা হয়, সেটারও সমাধান করা যাবে।

সমর ঢাকা থাকতেই প্রথম শ্রেণির হোটেল বুক করে রেখেছে। হোটেলের সামনে পৌঁছানো মাত্র হোটেলের লোকেরা সেখানে পৌঁছে গেলো। মন্ত্রী বলে

কথা, মন্ত্রী পারিবারিক সফরে এসেছে, তাকে আদর যত্ন না করলে কি হয়। মালপত্রসহ সবাইকে দোতলায় সবচেয়ে আরামদায়ক ও সুন্দর কক্ষে নিয়ে উঠলো। এত সুন্দর ঘরদোর সব দেখে সুদীপ্তা থ মেরে গেলো। কারণ এ মেয়েতো বাইরে এই প্রথম বের হয়েছে। ভিতরেই আলাদা বাথরুম, রান্নার ব্যবস্থা আছে। আলাদা আলাদা শোবার ঘর, খাবার ঘর। বৈঠকখানা সব কিছুই আছে। আগে থেকেই সবকিছু সাজানো। তাছাড়া কলিংবেল টিপলেই আর্দালী এসে হাজির এবং প্রয়োজন মাফিক হুকুম তালিম করে দিচ্ছে। দেব বললো, 'কাকু আমি এখানেই থাকবো, যা চাইবো তাই পাবো কোন অসুবিধা নেই। কাকু ওরা চলে যাক আমি আর তুমি থাকি।'

কাকু বললো, 'তুমি কি মা ছাড়া থাকতে পারবে? একটু পরেই তো মা-মা বলে কান্না জুড়ে দিয়ে বলবে, আমি মা ছাড়া থাকতে পারি না।'

– তাতো পারিই না। তাহলে এক কাজ করো। মাও আমাদের সঙ্গে থাক। তাহলে বেশ মজা হবে।

– হ্যাঁ, মজা তো হবে কিন্তু মা যদি রাজী না হয় তাহলে?

– কেন রাজী হবে না, আমি রাজী করাবো। তুমি কোন চিন্তা করো না।

– আচ্ছা তাই কর, তোমার কাকু নিশ্চিত হলো।

সমুদ্রে স্নান করার খুব সখ অমরের। সুজাতাকে যেতে বললো কিন্তু সুজাতা কিছুতেই যেতে রাজী নয়। সমুদ্রে নাইতে এসেছে কিন্তু বেনী ভিজাবে না, এ কেমন কথা। সুজাতাকে রাজী করাতে না পেরে অমর মাকে বললো,

– মা তুমি সুজাতাকে একটু বলে দাও না, আমার বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে একসঙ্গে সবাই মিলে স্নান করবো।

– আমার বলার কি আছে? সুজাতা যদি ইচ্ছে করে তো যাক।

– আচ্ছা, সুজাতা মা সুজাতা, এদিকে এসো তো মা।

ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সুজাতা এসে বললো, 'বড়মা ডাকছ কেন?'

– বোস এখানে। সমুদ্রে যাচ্ছো না কেন?

– কে বললো আমি সমুদ্রে যাচ্ছি না, যাবো তো।

অমর বললো, 'যাবে তো চলো।'

– না আমি তোমার সঙ্গে একা একা যাবো না, বাড়ির সবার সঙ্গে যাবো।

– এসো একা কীসে? আমার বন্ধু-বান্ধবীর সখ এক সঙ্গে তোমাকে নিয়ে সমুদ্রে নামবে, চলো।

– না না এতোলোকের মাঝে আমার ভীষণ ভয় করে- তার চেয়ে সবচেয়ে ভালো কথা তোমার বন্ধুকে তোমার সাথে নিয়ে যাও।

– তোমার কাছ থেকে উপদেশ নিতে আসিনি। আমি বলছি, চল। বড়মা বললো, 'সুজাতা তো ঠিকই বলেছে। তোমার বন্ধুকে সাথে নিয়ে যাও। তাছাড়া মেয়েটা ভয় পাচ্ছে, কোনদিন তো সমুদ্রে নামেনি। যা তুই সমরকে নিয়ে যা।' একথা শুনে সমর বললো, 'কোথায় আমাকে নিয়ে যাবি?' অমর বললো, 'তোকে নয় সুজাতাকে আমাদের সঙ্গে সমুদ্রে যেতে বলছি, তা কিছুতেই শুনছে না।' সমর বলল, 'এই সুজাতা যাচ্ছো না কেন? যাও সমুদ্রে তোমার খুব ভালো লাগবে।' এক প্রকার জোর করেই সমর সুজাতাকে পাঠালো।

সুজাতা বড়মা ও জ্যাঠা বাবু ছেলে-মেয়ে ও স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিন সমুদ্রে স্নান করতে গেলো ভাটার সময়। যতীন বাবু সুজাতার প্রশংসা করে বললো, মা তুমি ছিলে তাই আমরা সমুদ্র স্নান করতে পারলাম। সুজাতা লজ্জা পেয়ে বললো, জ্যাঠা বাবু আপনি একি বলছেন, আপনার ছেলেরা ছিলো বলে এতো আনন্দ করতে পারলাম। আর আপনাদের একটু ঘুরিয়ে আনতে পারলাম। আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করবেন, আমরা যেন আপনাদের সেবা করে আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারি। সমুদ্র স্নান করে ঐদিন কক্সবাজার থেকে পরের দিন সকাল বেলায় ওরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ঢাকা থেকে যতীন বাবুরা বারদি লোকনাথ বাবার আশ্রমে দুপুরে এসে পৌঁছালো। ওখানে উনারা বাল্য ভোগ, রাজভোগ কোনোটাই দিতে পারেনি। একজন কর্মচারী এসে বললো, বাল্যভোগের কথাই বলি না, রাজভোগও তো হয়ে গেছে। সবাইকে ভাগ করে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। সমর এসে বললো, 'প্রসাদ কি একটু পাওয়া যাবে না।' বললাম না- লোকটা বললো, না থাকলে কোত্থেকে দিবো। সমর বললো, অমর দেখতো সত্যি কিনা? ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করবে তাও এতো কার্পণ্য! লোকটা ধেয়ে এসে বললো, 'আপনি কে হে? বাবার আঙ্গিনায় এসে এমন দুর্ব্যবহার করছেন কেন?'

অমর আস্তে আস্তে মন্দিরের সামনে এসে বললো, 'আমরা যখন বাবার উদ্দেশ্যে বাবার এখানে তিন দিন থাকবো। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিন।'

লোকটি বললো, 'পূজা এখানে একবারই হয় এখন কি হবে।'

– কী আবার হবে পূজোর ব্যবস্থা করুন টাকা দিচ্ছি।

– কি করে ব্যবস্থা করবো?

– আপনার ব্যবস্থা করতে হবে না। বাবাই তার ভক্তদের কথা ভেবে পূজার ব্যবস্থা করে প্রসাদ দিবেন। বলেই সমর পকেট থেকে টাকা বের দিচ্ছিল তখন একজন কর্মচারী এসে বললো, 'কাকাবাবু এদিকে আসুন, কথা আছে।'

লোকটা যখন কাকা বাবুকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিলো, তখন অমর বাধা দিয়ে বলে, 'কোথায় যাচ্ছেন? আগে আমার কথা শুনুন।' কর্মচারীটা থমকে দাঁড়ালো এবং কাকাবাবুকে বললো, 'উনি যা বলেন তাই শুনুন। আমি পরে আপনার সঙ্গে কথা বলবো।' এতক্ষণে বাবার আঙ্গিনায় অনেক লোক জড়ো হয়েছে। আমাদের মাফ করে দিন। এই তোরা এসে রাজভোগের ব্যবস্থা কর। অমর হেসে দিয়ে বললো, 'টাকা নিয়ে রাজভোগ করে দিবেন, তাতে মাফ করার কি আছে। যাক থাকার ব্যবস্থা করে দিন। ঘরদোর যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।' এদিকে ঘটনাটা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে, থানা থেকে পুলিশ এসে সমস্ত মন্দির ঘেরাও করে রেখেছে, পুলিশ দেখেই তো মন্দিরের লোকদের সন্দেহ হচ্ছিলো। মন্দিরের কর্মকর্তারা যারা বাড়ি চলে গিয়েছিলো সংবাদ পেয়ে তারাও ফিরে এসে মন্ত্রী মশাই-এর তদারকি করতে লাগলো। আবার নতুন করে সবার জন্য রান্না করতে হলো। পুলিশতো কম নয়, রাতে তাদেরও খাবার ব্যবস্থা করতে হলো। যে ঘরে মন্ত্রী মশাই-এর রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো সে ঘরের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলো।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সুদীপ্তা যখনই মন্দিরের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ালো, তখন দেখে নানা ধরনের নানা রঙের কবুতর বাক-বাকুম করে উড়ছে। একবার মন্দিরের চালে, একবার উঠোনে আর এক বার বারান্দায় নেচে বেড়াচ্ছে। সুদীপ্তা এ দৃশ্য দেখে দেখে ভাইকে ডেকে তুলে আনলো। ভাই দেখে যা, ভাইও এ দৃশ্য দেখে হাত তালি দিয়ে নাচতে লাগলো। ছেলে-মেয়েদের আনন্দ দেখে বাড়ির অন্যরাও বের হয়ে এসে কবুতরের নৃত্যের সাথে সাথে বাচ্চাদের নৃত্যও দেখতে লাগলো।

বারুদি লোকনাথ বাবার আশ্রমে পূজাও দেওয়া হলো এবং আনন্দও উপভোগ করলো। সকালবেলা বাল্যভোগ দিয়ে এবং ভোগ গ্রহণ করে বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো। কর্তব্যরত যে সমস্ত পুলিশরা ছিলো তারা মন্ত্রী মহোদয় ও তার পরিবারকে ঢাকার রাস্তায় রওনা করে দিয়ে ফোন করে দিলো। সমরের খুব ইচ্ছে ছিলো, মা-বাবাকে আর কয়টাদিন ঢাকা নিয়ে রাখতে পারলে খুব ভালো লাগতো। কিন্তু সরলা ও যতীন বাবু এতোদিন বাড়ি ছেড়ে এসেছে, অন্য লোকের উপর বাড়ির ভার দিয়ে কিছুতেই আর বাইরে থাকতে চাচ্ছে না। যতীন বাবু বললো,

- বাড়ির মত আরাম কি অন্য কোথাও পাওয়া যাবে? সুজাতা বলল,

– ঠিক বলেছো জ্যাঠাবাবু নিজের বাড়ি, নিজের বিছানার মতো আরাম আর কোথাও নেই।

ভেংচি কেটে অমর বললো, 'তাতো হবেই, আমার বিরুদ্ধে যাওয়া ছাড়া তোমার কি কোন কাজ নেই?'

– ও বড়মা, দেখলে আমাকে কথাই বলতে দেয় না, শুনতে পাচ্ছ?

– কথায় কথায় ম্যা ম্যা, যেন দেবের চেয়েও ছোট, ছোট্ট খুকী। মা বললো, সর্বদা মেয়েটাকে জ্বালাতন করে, আমার আর ভালো লাগে না। অমর ঝগড়া করার জন্য এ গাড়িতে এসে বসেছে, সেটাও করতে পারছে না। তাই আবদারের সুরে মাকে বললো, ও মা তুমি সর্বদা তোমার পেটের ছেলের বিপক্ষে যাও কেন? ঐ মেয়েটা তোমার আপন হলো আর আমি হলাম পর। মেয়ের আহ্লাদে বাঁচি না। আর মেয়েটা আমাকে সর্বদা বকা খাওয়ানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। আমার মার আদর খাচ্ছে পরের বাড়ির মেয়ে। মা বললো, 'চুপ কর তো বুড়ো ছেলের প্যানপ্যানানি ভালো লাগে না। আয় আমার কাছে এসে বোস। তোর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেই।'

টাঙ্গাইল এসে পৌঁছতে ওদের সন্ধ্যা লেগে গেলো। বাড়িতে এসে দেখে আত্মীয়রা সব কিছু পরিপাটি করে রেখেছে। সুজাতা হাত-মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে কাপড় ছেড়ে একেবারে রান্না ঘরে ঢুকলো। অমরের এক কাকাতো বোন ছিলো অঞ্জনা সে সুজাতার হাত ধরে বললো, 'বৌদি তোমার কিছু করতে হবে না। এতদূর থেকে এসেছ, এখন একটু বিশ্রাম কর, যা করার সব আমিই করে নিবো।'

– যাক করো 'খন।

সবাই জ্যাঠাবাবুর ঘরে গিয়ে বসলো, ঘরখানা পরিষ্কার করে সুন্দর করে গোছ-গাছ করে রেখেছে। সবাই দেখে প্রশংসা করল। বাড়িতে যে আত্মীয়দের রেখে গিয়েছিলো, তারাও সবাই গোল হয়ে জ্যাঠাবাবুর ঘরে বসে পড়লো, তাদের ভ্রমণের গল্প শুনবে বলে। কে - বলবে সুজাতা।

– বক্তা হিসেবে তুখোড় অমরদা, ওকেই বলতে দাও। অমর বললো- না, আমি নই সুজাতা বলুক।

– এই যার কথা ভালো লাগবে, যে ভালো বলতে পারবে সেই বলুক। তোমরা সিদ্ধান্ত নাও কে বলবে। জ্যাঠাবাবু বললো, 'অমর বলা শুরু করুক আর সুজাতা শেষ করুক। তাতে কারো কোন আপত্তি নাইতো?' সবাই বললো- না - আপত্তি নাই। অমরদা তুমি আরম্ভ করো।

বাবার কথা তো ফেলে দেয়া যায় না। তাই বাধ্য হয়ে অমরই শুরু করলো।

১৬শ অধ্যায়

অন্ধকার রাতের একটা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। যখন প্রকৃতি অন্ধকারে ঢলে পড়ে নীরব নিঝুম হয়ে আসে, যখন ঝিঁঝি পোকারা রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজেদের রচিত গান সুর করে গেয়ে পরিবেশটাকে আরও মায়াবী করে তোলে। যারা নিচে বসে বসে ভ্রমণ কাহিনি শুনছিলো তারা নিজেদের অজান্তেই রাতের মোহে একজন অপরজনের অতি কাছাকাছি এসে পৌঁছালো। অমর যখন গল্প বলতে বলতে নিজেও আত্মমগ্ন হয়ে গিয়েছিলো। তখন হঠাৎ ভোরে সুদীপ্তা চিৎকার করে উঠলো, 'উঃ একেবারে গায়ের উপর উঠে এসেছিস? সরে যা না ভাই। ভাই বললো, 'কি করেছি, তুইও তো মার কোলে উঠেছিস, তার বেলায়।' এতক্ষণ সবাই নিবিষ্ট মনে গল্প শুনে যাচ্ছিলো হঠাৎ করে সুদীপ্তা গল্প শোনার আনন্দ কিছুটা ভঙ্গ করলো। সবাই একটু বিরক্ত হলো আবার নড়েচড়ে তারা ভালোভাবে জায়গা করে নিয়ে বসে পড়লো। অমর এত সুন্দর করে সহজ ভাষায় খুব সরলভাবে বলছিলো যে মনে হচ্ছিলো যেন চোখের সামনে সত্য ঘটনাই দেখছে। টু শব্দটি না করে সমরের গল্প বলা শুনছিলো। অমর যেমন রাজনৈতিক বক্তব্য সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়ে থাকে তখনও মানুষ একাগ্রচিত্তে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে। সুদীপা তার কাকার বক্তৃতার ফ্যান। তাই ওর কানে মধুর মতো লাগছিলো। অমর ঢাকা থেকে শুরু করে কক্সবাজার ও অন্যান্য সি-বিচের বর্ণনা দিয়ে ভ্রমণটাকে আরও আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য করে তুলেছিলো। অমর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'একবার শরীরটাকে একটু টানটান করে নিই। আর এরপরের ঘটনা মানে লোকনাথ বাবার আশ্রম ভ্রমণের কথা বর্ণনা করবে আমাদের স্বনামধন্য বক্তা শ্রীমতি সুজাতা ভট্টাচার্য। আমি বলে কতটুকু আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছি। এবার আপনারা আসল আনন্দ উপভোগ করবেন সুজাতার মুখে এবারের ভ্রমণকাহিনী শুনে।' এ সমস্ত কথা শুনে সুজাতা সত্যি সত্যিই লজ্জা পাচ্ছিলো। তাই লজ্জাবনত হয়ে মুখ নিচু করে বলতে লাগলো, 'এত সমস্ত আমি কিছু নই, আমি সাধারণ মেয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো আমার অভ্যাস নয়। তবুও আমি চেষ্টা করবো সুন্দর করে বলতে যাতে সবার কিছুটা হলেও ভালো লাগে।' সুজাতা শুরু করলো লোকনাথ বাবার আশ্রমে প্রবেশের পরই আশ্রমের সেবাইত ও অন্য কর্মচারীদের অমানবিক ব্যবহারের কথা দিয়ে গল্প বলতে লাগলো। সুজাতা একবারও বলতে ভুললো না যে অমরকে নয় সমরকেই উনারা মন্ত্রী ভেবে যথেষ্ট সমাদর করতে লাগলো। কি আর হবে। যেখানে ভুল দিয়েই প্রথমে শুরু হয় সেখানে তো ভুল থেকেই যায়।

সুজাতা আবার রস দিয়ে কথা বলতে পারে। সুজাতার গল্পে ছোটরা হেসেই লুটোপুটি। জ্যাঠাবাবু বললেন, 'আর বড় করো না গল্প, দেখ রাত প্রায় দুটো বাজে। ছোটরা ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখ তোমাদের বড়মা কেমন করে ঢুলছে।'

একথা শুনে বড়মা সত্যি সত্যি লজ্জা পেলো। সুজাতা বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ আর বড় করবো না। এই বলে সে গল্পটা তাড়াতাড়ি শেষ করে আসর ভঙ্গ করে শোয়ার ব্যবস্থা করলো।

মেঘে মেঘে অনেক বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। যতীনবাবু ও সরলার বয়স বেড়ে বৃদ্ধের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে। আগের মত আর চলাফেরা ও কামকাজ করতে পারে না। তাদের একটাই মাত্র দুঃখ ছেলেটাকে একটা উপযুক্ত সঙ্গিনী জুটিয়ে দিতে পারলো না। শত প্রলোভন, কত কিছু বলেও তাকে বিয়ের পিড়িতে বসাতে পারলো না। এজন্য মা-বাবার দুঃখের সীমা নেই।

সমর ও যতীনবাবু কলেজের উন্নতির দিকে নজর দিচ্ছে। একদিন যতীন বাবু কোর্ট থেকে টাঙ্গাইলের বাড়ি এসে বললো, 'সরলা আমরা কলেজ বিল্ডিংটা যে পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ করতে যাচ্ছি সেটা দেখতে যেয়ে কাগজপত্র ঘাটতে ঘাটতে দেখলাম, ওখানকার ২০ শতাংশ জায়গা আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে, কিন্তু জায়গাটা আমাদের নয়। বলতো এখন কি করি?' সরলা সত্যিই সরল প্রকৃতির। কোন কিছু চিন্তা না করেই বললো, তোমার যেটা নয় সেটা তুমি নিবে না। প্রকৃত মালিককে সেটা দিয়ে দাও। তাতেই ল্যাঠা চুকেবুকে যাবে। উকিল বাবু হেসে দিয়ে বললো, 'না ভেবে না চিন্তা করে বলে দিয়েই খালাস। এজন্যই তো লোকে বলে মেয়ে মানুষের চৌদ্দ হাত কাপড়েও বেড় আসে না।' সরলা ঝাঁঝালো সুরে রাগ করে বললো, 'এমন করে বলবে না। মেয়ে বলে তারা মানুষ নয়। তোমাদের সাড়ে তিন হাতে বেড় আসে আর মেয়েদের চৌদ্দ হাতেও বেড় আসে না।' এমন কথা শুনলে কার না রাগ হয়। কেবল মেয়েদের ঠেস দিয়ে কথা বলার অভ্যাস আজও তোমাদের গেলো না। পরবর্তীকালে যতীন বাবু কাগজপত্র ঘেটে সব বের করে ফেলেছে, কীভাবে জমিখানা ওখানে এসেছে। ঘারিন্দার জমিদাররা আউলটিয়ার মালীদের নিষ্কর ভূমি দান করেছে ওখানে থাকার জন্য। জমিদার বাড়িতে মালীরা বাগান করবে, বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করবে। মালীরা বংশ পরম্পরায় আউলটিয়ায় বসবাস করছে, তাই তাদের জমির দরকার নেই বলে সুরুজ যায়নি। ওরা ভুলেই গিয়েছিলো যে ওখানে জমিদারের দানের ভূমি আছে, কিন্তু ভুলে গেলে কি হবে, সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই। উকিল বাবু কাগজপত্র পুংখানুপুংখরূপে দেখে আউলটিয়ার হরেন মালী, উপেন মালীদের উকিল বাবুর টাঙ্গাইলের বাসায় রবিবার সকাল ১০টায় উপস্থিত হওয়ার কথা জানালো। ওরা অতি সাধারণ লোক, গ্রামের এক কোনে পড়ে থাকে। এটা সেটা হাতের কাজ করে দিন মজুরের কাজ করে দিন কাটায়। উকিল বাবু কেন ওদের যেতে বললো। একথা শুনে ওরা খুব চিন্তায় পড়লো। তবুও যেতেই হবে, বাড়ির বৌঝিরাও খুব চিন্তা করছিলো, হরেন ও উপেনরা দ্বিধাচিত্ত নিয়ে আউলটিয়া থেকে রওনা হলো। উকিল বাবু সাদরে আমন্ত্রণ করে ঘরে নিয়ে গেলো। তখনও ওদের সংশয় কাটেনি। হা করে

উকিলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। উকিল বাবু ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো ওরা ভয় পেয়েছে। উকিল বাবু হেসে বললো, 'ভয় পাচ্ছ কেন? ভয়ের কিছু হয়নি। বরং তোমাদের ভাগ্য খুলে গেছে, তোমরা যা জানতে না আজ তাই জেনে খুশি হবে। শোন তা হলো, আমি যে গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কলেজ করেছি। তার পশ্চিমাংশে যে ঝোপ জঙ্গল আছে ওখানে কিছু উদ্বৃত্ত ভূমি আছে, কাগজপত্র ঘেটে আমি বের করি যে ঐ ২০ শতাংশ জমি তোমাদের। ঐ জমিটা ঘারিন্দার জমিদার তোমাদের নিষ্কর ভূমিদান করেছে। সুতরাং ঐ জমির মালিক তোমরা। তোমরা ওটাতে বসবাস করতে পারো অথবা বিক্রিও করে দিতে পারো। কি করবে সেটা আমাকে জানাবে। যদি তোমরা ওটা বিক্রি কর তবে আমার কাছে করো। আমি কলেজটা ওদিকে বাড়িয়ে বড় করবো। বিক্রি করা না করা তোমাদের ইচ্ছ।'

হরেন বলল, 'বাবু এটা কি বললেন! আমাদের ঐ জমির দরকার হয়নি তাই আমরা খোঁজ করিনি। আমাদের আগে জানা ছিলো না আপনার খোঁজে যখন এসে পড়েছে কাজেই সেটা জনগণের মঙ্গল কাজে লাগলে নিশ্চয়ই সবার মঙ্গলই হবে। বাবু বললো, 'যাও, বাড়ি যাও। সবার সঙ্গে আলাপ কর। সবার মতামত নাও তারপর সিদ্ধান্ত নাও কি করবে। আমি কখনও তোমাদের জোর করবো না।' মালীরা খুব খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেলো। বাড়ির লোকেরা ওদের হাসি খুশি মুখ দেখে শান্তি পেলো। আর বলাবলি করতে লাগলো এতক্ষণ যে উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছি তা কি আর বলবো, হরেন বললো, 'উকিল বাবু ভালো মানুষ জানি কিন্তু এতো ভালো তা আগে জানতাম না। গ্রামের অন্য কোন লোক হলে ঐ জমির সন্ধান কাউকে না জানিয়ে একেবারে নিজেই আত্মসাত করে দিতো। একেই বলে দেবতুল্য।'

যতীন বাবু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে বিক্রির উপযোগী করে হরেনদের কাছ থেকে ২০ শতাংশ জমি কলেজের নামে কিনে নিলেন। এতে গ্রামের লোকেরা আরও তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো আর আশীর্বাদ করলো। কাগজপত্র ঠিকঠাক করে আমার জন্য উকিলবাবু সমরকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলো। পূর্বের প্ল্যান অনুসারে পশ্চিমাংশে কলেজের হোস্টেল তৈরী পূর্বাংশে অনার্স ক্লাস তৈরীর অনুমোদন নিয়ে আসা হলো। এখন আর সুরুজ গ্রামকে গ্রাম মনে হয় না। কলেজের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হয় যেন বড় একটা শহরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। কলেজের পাশ দিয়ে বাজার। বাজারে আধুনিক দোকানপাট সব রকমের ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম। সর্বদা গাড়ি চলছে, কোন অসুবিধা নেই। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজারেই পাওয়া যায়।

সুজাতা খুব খুশি। প্রথমে অনার্স খুলবে তার বিষয় রাষ্ট্র বিজ্ঞানে। সমরের পরেই কলেজে সুজাতার ক্লাস, একথা ভেবে সে আনন্দে আটখানা।

ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, ওদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত মনে এই গ্রামে বসে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা দিতে পারবে, সেটা কি কম সৌভাগ্যের বিষয়।

সবাই যার যার কর্ম নিয়ে সে সে নিমগ্ন। একথা সত্য, কিন্তু সুজাতা কাজে নিমগ্ন থাকলেও মাঝে মাঝে যেন কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেন এমন হয়। এক এক সময় ভাবে তার মত সুখী এ জগতে কেউ নেই। আবার মনে হয় এমন লাগে কেন। মনে হয় সে নিঃস্ব। তার কিছু নেই। কেবল উদাস উদাস মনে হয় এমন হয় কেন তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। তার প্রিয়তম স্বামী, যার তুলনা হয় না। যিনি দেবতুল্য তবুও কেন এত নিঃস্ব মনে হয়। সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে তার প্রিয়া সুজাতাকে ভালোবাসে। সমরের ভালোবাসার এতটুকু কমতি নেই। সুজাতা সব বুঝে, সমরকেও জানে তবুও কেন এমন মনে হয়। সুদীপ্তা এসে বলে, 'ও মা তুমি এমন করে আছো কেন? তোমার কি শরীর ভালো নয়। দেখিতো জ্বর-টর আবার এলো নাতো।' মা বলে- পাকামো করতে হবে না। মাথাটা কেমন কেমন করছে।

– ঐ তো আমি ঠিকই ধরেছি শরীর ভালো নেই, মাগো তোমার শরীর ভালো না থাকলে কি আমরা ভালো থাকবো। বলো না তোমার কেমন লাগছে? এমন সময় সমর এসে সুদীপ্তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে মা?' সুজাতা কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো 'না না কিছু হয়নি। তোমার মেয়ের আহ্লাদ।'

– আমার মেয়ে এতো আহ্লাদ কার কাছ থেকে শিখলো বল? সে তো তার মায়ের কাছ থেকেই শিখেছে। সুদীপ্তা বললো- ঠিক বলেছ বাবা, তোমার কথাই ঠিক।

সমর সুজাতার কোল ঘেঁষে এসে বলল, 'মেয়ের দৃষ্টি ভুল নয়, আমিও লক্ষ্য করি মাঝে মাঝে তুমি যেন কেমন দুঃখী দুঃখী ভাব নিয়ে বসে থাকো, আর কি যেন চিন্তা কর। তোমার মনে কোন কিন্তু থাকলে বলে পরিষ্কার হও। তা না করে মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা পুষে রাখো কেন?'

– তুমিও তো তোমার মেয়ের মতো কথা বলছো, সে না হয় অবুঝ বালিকা তুমিও কি তাই? আচ্ছা বাপ-বেটিতে তোমরা যা খুশি ভাবতে থাক, আয় বাবা দেব। আমি আর তুই শুয়ে পড়ি।

– যা যা মা শুয়ে পড়। এসো সুজাতা।

সবাই যার যার ঘরে শুয়ে নিটালে ঘুমুচ্ছে। শুধু সুজাতা দু'চোখের পাতা এক করতে পারছে না। রাতের অন্ধকার যেন আরও নিকষ কালো হয়ে সমস্ত ঘরখানাকে গ্রাস করে ফেলে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই অন্ধকারে

নিঃশ্বাস নিতে সুজাতার কষ্ট হচ্ছে। চোখের পাতা খুলেও যেন নিগূঢ় অন্ধকারে চোখ ডুবে যাচ্ছে। সুজাতার অজান্তেই একটা অস্ফুট আওয়াজ হলো। সমর আওয়াজ শুনেই পাশ ফিরে বুঝতে পারলো সুজাতা অনেক দূরে শুয়ে আছে। সমর হাতের বেষ্টনী দিয়ে সুজাতাকে পাশ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে? তুমি কি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছো? কথা বল? এমন আওয়াজ করলে কেন?' সুজাতা সত্য কথাই বললো, আমার ঘুম আসছিলো না। তাই অস্বস্তি হচ্ছিল। নাও তুমি ঘুমাও এখন আমিও ঘুমোবো। ঘুমোবো বললেই কি ঘুম আসে। সুজাতার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিলো না। তবুও চেষ্টার কমতি ছিলো না। সমর সুজাতার এমন অবস্থা দেখে শরমে মরে যাচ্ছিলো। আর সুজাতাকে আদরে সোহাগে একাকার করে দিচ্ছিলো। এত আদর সোহাগে ঘুম আসবে কি, তার পরিবর্তে সুজাতা অজোর ধারে কান্না করছিলো। তাতে সমরের মনঃকষ্ট আরও বেড়ে গেলো। সমর গভীর ভালোবাসায় সুজাতাকে বুকের ভিতর চেপে ধরে বললো, কি হয়েছে আমাকে বল, আমি ছাড়া তোমার এতো আপন কে আছে? বল বল সব দুঃখ দূর হবে বল। ওগো আমি কিছুই বলতে পারছি না। একথাটাও সুজাতা স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে বলতে পারেনি। একটুতেই প্রিয়তমা তার প্রিয়তমকে মুখ ফুটে অসহায়ত্বের কথা বলতে না পেরে গুমরে গুমরে মরেছে। সমরের আদরে ও সান্ত্বনায় মনের কথা খুলে বলতে না পারলেও সে আরও জোরে জোরে কেঁদে উঠলো। সমর আরও বেশি কাছে এসে সুজাতাকে কোলে বসিয়ে বলল, 'সু-তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর, ভরসা কর। তাহলে তোমার ভিতরের যে দুঃখ কষ্ট আছে, তা অগোচরে প্রকাশ করতে পারো। তোমার এমন অবস্থায় আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না। ওগো তুমি তোমার প্রিয়তমকে সব কিছু খুলে বলো। আমি বুঝতে পারছি তোমার এমন কোনো কষ্ট হয়েছে, যা তুমি আমাকেও বলতে পারছো না। তবুও আমাকে বলতেই হবে। আমরা যে একে অপরের পরিপূরক।' এত কথা শুনে সুজাতা সমরের গলা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ, বুকে বুক লাগিয়ে চুপ করে বসে রইলো। এভাবে থাকতে থাকতে এক সময় সুজাতা ঘুমিয়ে পড়লো। সমর কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুজাতাকে ঘুমন্ত অবস্থায় অতি যত্নে বালিশে মাথা দিয়ে শুইয়ে দিলো।

সুজাতা ঘুমিয়ে পড়লো ঠিকই কিন্তু সমরের কিছুতেই ঘুম এলো না। সুজাতা এমন করছে কেন, তার কারণ কি। এ কথা কিছুতেই সমরের বোধগম্য হচ্ছিলো না। এতটা বছর দু'জনে সুখে-দুখে, শয়নে স্বপনে একত্রে থেকেছে কোনদিন দুজনের মধ্যে এতটুকু মনোমালিন্য হয়নি। তবে কি আজ নতুন করে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের চির ধরলো। এ কথা কারও কাছে বলারও নয়, কি করবে সমর। এত ভালো ব্যবহার যে মেয়ের, যাকে কেউ সহজে মন্দ বলতে পারবে না। সেই আজ কেন অবিশ্বাস করছে। কেন ভরসা করতে পারছে না,

আমি ওর প্রতি কোন অন্যায় করেছি, যা ওর চোখে ধরা পড়েছে কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি অথচ সে মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারছে না। সে তো অবিবেচক নয় সর্বদাই যুক্তি দিয়ে কথা বলে এবং যুক্তি দিয়েই সবকিছু বুঝতে চেষ্টা করে তবে আজ কেন এমন হলো। তবে কি কোন কারণে আমার এ সুখের সংসার ভাঙন ধরতে চলেছে, না না আমি কিছুতেই তা হতে দিবো না। আমার সন্তানের জননী আমার স্ত্রী সবাই আমার অতি প্রিয়। ওদের আমি প্রিয় তবে কেন এমন হতে যাচ্ছে। সুজাতা অবুঝ নয়, ওকে বুঝিয়ে আমি ঠিকই সব বের করতে পারবো। এ বিশ্বাস ওর প্রতি আমার আছে। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি চাকর-বাকর থেকে কর্তা ব্যক্তিটিকে পর্যন্ত সংসারের গভীর ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। এত সহজে সে বন্ধন ছুটে যেতে দিবো না। সুজাতাকে বুকের আরও কাছে টেনে এনে বললো, আজ তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমো, তোমাকে বিরক্ত করবো না। পরে এ জট আমি খুলবোই। তোমাকে কিছুতেই মনে কষ্ট পেতে দিবো না।

১৭শ অধ্যায়

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সমর দেখে সব স্বাভাবিক। সমর আশ্চর্য হয়ে গেলো। এ কোন মন্ত্র বলে এমন হয়ে গেলো। সুজাতা সদ্য স্নাত এলায়েত চুলে সমরের সামনে এসে বললো,

– টেবিলে বসো, সকালের নাস্তা হয়ে গেছে।

– ওরে আমার লক্ষ্মী, বেশ বসছি।

ছেলেমেয়ে ও জ্যাঠা বাবু এসে বসলো। একান্নবর্তী পরিবারের লোকেরা এক সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে খাবে এটাই তো আনন্দ। জ্যাঠা বাবু নাতিকে কাছে নিয়ে বসিয়ে আলাপ করতে করতে খাচ্ছে। সুদীপ্তা বড় ঠাম্মিকে দেখিয়ে বলল, 'দেখলে বড় ঠাম্মি কেমন স্বার্থপর দাদু তার নাতিকে ঠিকই কাছে নিয়ে গল্প করে করে খাচ্ছে। তুমি আর আমি পর হলাম।'

সুদেব একটু তোতলা, তোতলা করে বললো, 'তোলাতো পলই তাই না দাদু। আমি আল তুমি দু'ভাই।'

ঝাঁঝিয়ে উঠে সুদীপ্তা ভাইকে ভেঙিয়ে বললো, তোলা ভাই তাই কি? আমরাও দু'বোন। বড় সরলা ও ছোট সুদীপ্তা। জ্যাঠা বাবু বললো, 'তোরা দু'বোন ভাই তো নস।'

– তাই কি? তোমরাও তো দু'ভাই, বোন তো নও।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছ দিদি ভাই, তফাৎ তো আছেই।

আমাদের বলতে হবে আমরা দু'ভাই, দু'বোন। তাহলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে। তাই নয় কি দিদি ভাই।

– অবশ্যই আমাদের কোনো ঝামেলা নেই।

আজকের ঝরঝরে রৌদ্র প্লাবিত সকাল দেখে কেউ বলতেই পারবে না। সুজাতার কাল রাত্রির আকাশে কি ঘনঘটা নেমে এসেছিলো। এত সহজে যে সে কালরাত্রি নেমে যাবে সমর ভাবতেই পারেনি। সুন্দর সকালে সুগৃহিণীর সুন্দর মুখখানা দেখে সমর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেও সে নিজের মনে চেপে গেলো গতকাল রাত্রের ভয়াবহ দুর্যোগের কথা। তাই সমর চাইলো না এমন কথার পুনরাবৃত্তি করে নতুন করে সুজাতার মনে কষ্টের সঞ্চার হোক। সকালে সুজাতা যখন দেখলো তার কিছুই হয়নি। সমরও সুজাতার কষ্ট লাঘব করার জন্য সে ঘটনার পুনরুত্থান না করাই শ্রেয় মনে করলো। সুজাতা এসে বললো, 'তুমি কলেজে যাচ্ছো তো? তোমার সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যেও।'

– আমি তো এখনই রওনা হচ্ছি।

– আমিও তাই যাবো।

– তবে দেব, দেব কার সঙ্গে যাবে।

– দেব হরিদার সঙ্গে যাবে এবং আমি বলেছি হরিদাই ওকে বেলা ১২টায় নিয়ে আসবে। রান্নাবাড়ার বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে। মাসীকে সব বলে দেখিয়ে দিয়েছি। মাসী ঠিকই পারবে।

– তাইতো এতো তাড়াতাড়ি রেডি হতে পেরেছো। তাহলে আমি প্রস্তুত হয়ে বের হলাম। গাড়ি বের করলাম। তুমি তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসো। দুজনে গাড়ি করে কলেজে সুরুজের দিকে রওনা হলো।

দুপুর বেলায় বড়মা সমর আর সুজাতার জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। সুজাতা সমরকে বললো, দেখ বড়মা নিজে রান্না করে আমাদের খাবার পাঠিয়েছে। খাবার রেখে ভোলাদাকে বললো, আজ আমরা এখানেই থাকবো, বড়মাকে চিন্তা করতে না করো। সমর বললো, 'বড়মা না হয় চিন্তা না-ই করলো, কিন্তু তোমার ছেলে কি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবে।'

– হ্যাঁ গো হ্যাঁ থাকতে অবশ্যই পারবে। বাড়িতে বড় মার কাছে থাকেই তো। তাছাড়া এখন থেকে অভ্যাস করা ভালো।

– বুঝেছি ঝাড়া হাত পা হতে চাও।

– চল আমরা বিকেল বিকেল কোয়ার্টারে চলে যাই। দপ্তরী সত্যেনদাকে বাড়ি ঘর পরিষ্কার করতে বলেছি। তুমি তোমার পছন্দমত বাজার করে নিয়ে এসো। তোমার পছন্দের খাবারই আজ রাতে খাবো।

– জো হুকুম, মহারানী, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হবে।

সমর বাজারের থলি হাতে নিয়ে বাজারের দিকে গেলো আর সুজাতা কোয়ার্টারের দিকে হাঁটতে লাগলো।

গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলো সত্যেন দপ্তরী। সে সুজাতাকে দেখে নমস্কার জানিয়ে বললো, ম্যাডাম দেখে নিন। কিছু লাগবে কিনা? সুজাতা বললো, তুমি কি দুপুরে খেয়েছো? সত্যেন আমতা আমতা করতে লাগলো। সুজাতা ধমক দিয়ে বললো, 'আমতা আমতা করার কি আছে, খেলে হ্যাঁ বলো, না খেলে না বলো। নিশ্চয়ই রান্নার আলসেমীতে খাওনি। কিছুই কি খাওনি?'

– না ম্যাডাম। টিফিন করেছি।

– কলেজে যেয়ে আমাদের খোঁজ নিবে না? যাও টিফিন ক্যারিয়ারে অনেক খাবার আছে, এনে খাও, আমি কলেজে আছি আমাদের খাবারের খোঁজও নিলে না। এমনি করে না খেয়ে খেয়ে কঠিন রোগ বাঁধিয়ে নিবে। তখন দেখবে কে? আগে থেকেই সাবধান হও। সত্যেন মাথা নিচু করে বাম পায়ের বুড়া আঙ্গুল দিয়ে মেঝেতে মাটি খুড়তে লাগলো।

– এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে খাবারগুলো নিয়ে এসে খাও এবং খাওয়ার পরে তোমার স্যারকে চা নাস্তা করে দাও।

দু'জনে বেশ ভালোভাবেই দিন কাটাতে লাগলো। ছেলেমেয়েরাও বাবা-মার জন্য অস্থির হয়নি। ঠাম্মি আছে দাদু আছে আবার কাকে লাগবে ওদের। ওদের কাছে থেকেই তো বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সুদীপ্তা ও সুদেব। সুজাতাও আজকাল চায় ঠাম্মির আদরেই ওরা বড় হোক। তাই উনাদের কাছেই থাকে। ছেলেকে মাঝে মাঝে একটু বিরক্ত করে তা করুক তাতে কোন অসুবিধা হয় না।

অমর কিছুতেই সুজাতাকে চোখের আড়াল করতে চায় না। একটু পর পর ফোন করে খবরাখবর নিবে। সুজাতা কাজে ব্যস্ত থাকলে ফোন না ধরতে পারলে যা না তাই বলে ফোনেই বকাবকি করতে থাকে। আজকাল অমর ভদ্রতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। সুজাতা স্পষ্ট করে ফোনে বলে দিয়েছে। যদি আমাকে এভাবে বিরক্ত কর তবে আমি এখান থেকে চলে যাবো।

– এই কোথায় যাবে, আমি সেখানেই যাবো তোমার রেহাই নেই।

– কোথায় যাবো- যেখানে গেলে তুমি আমাকে পাবে না ঠিক সেখানেই যাবো।

– তোমাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না। আমার অন্তরে বেঁধে রাখবো, পালাবার কোনো পথই রাখবো না।

– সে দেখা যাবে। বলে সুজাতা ফোন রেখে দিলো। ফোন রেখে দিলেই নিস্তার আছে? রিং বেজেই চলছে, সমর এসে ফোন ধরলো।

– হ্যালো সমর, তর অর্ধাঙ্গিনী কই, তাকে যে আজকাল পাওয়াই যায় না।

– দেখি- কোথায় গেছে, তুই একটু ধর। সমর সারা বাড়ি খুঁজে কোথাও না পেয়ে বাথরুমের দরজা নক করে বুঝতে পারলো, বাথরুমে। এসে ফোন তুলে বললো, একটু পরে ফোন কর। এখন সুজাতা বাথরুমে।

– তাতো হবেই। তোর বউয়ের পাখনা গজিয়েছে না?

– কি বলছিস? জরুরী কথা থাকলে বল আমাকে, ও বাইরে এলে ওকে বলবো।

– সব কথা কি সবাইকে বলা যায়। ওকে বলিস একটু পরে ফোন করবো। তখন যেন পালিয়ে না যায়।

এর মধ্যে ছেলে-মেয়েরা বাবা-মার কাছে চলে এলো। কয়দিন ওরা আর মা-বাবা ছাড়া থাকবে। মা-বাবা কলেজে গেলে খালি বাড়িতে একলা থাকতে হয় তাই তাদের এখানেও ভালো লাগছিলো না। বাবাকে বলে ওরা আবার ঠাম্মির কাছে চলে গেলো। এইভাবে কোনো রকমে দিন চলতে লাগলো কিন্তু সুজাতার দিন কিছুতেই কাটতে চায় না। কীসের যেন একটা বিষের কাঁটার মতো তার গলায় বিঁধে আছে। সেটাকে কি করে বের করবে। নাকি অপারেশন করে ভয়ঙ্কর কাঁটাটাকে বের করে আনলে বিষ যন্ত্রণার সমস্ত জ্বালা নির্মূল হয়ে সুজাতার জীবনে শান্তি ফিরে আসবে। সুজাতা আপ্রাণ চেষ্টা করছে শান্তি পেতে।

অমর ঢাকা থেকে একেবারে সুরুজ এসে হাজির হয়েই সুজাতাকে উচ্চ স্বরে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকলো। সুজাতা তো এমন ডাকে অভ্যস্ত নয়। তবুও সে খুবই বিরক্ত হলো। এত চিল্লাচিল্লি করে ডাকার তো কোনো দরকার নেই। অন্য একজনের গৃহবধূ, তোমার তো কেউ নেই।

– কি বললে! আমার কেউ নও। তবে তুমি কে?

– আমি কে তা তুমি জানো না? সামাজিকভাবে ধর্মীয়ভাবে আমি সমরের অগ্নিসাক্ষী করা বিবাহিত স্ত্রী। এটাতো সবাইকে মেনে নিতেই হবে, এমনকি তোমাকেও মানতেই হবে।

– ঠিক মানবো? সমর আর আমি অভিন্ন আত্মা, আমরা দুজনে বন্ধু, হরিহর আত্মা, সমরের স্ত্রী মানেই আমারও।

– ছিঃ এমন পাপ কথা উচ্চারণ করো না।

– এই কীসের পাপ, পাপ মনে করলেই পাপ, না মনে করলে কিছু না।

– সরো, বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি এখান থেকে চলে যাবো।

– কোথায় যাবে?

– কেন, এতবড় দুনিয়াতে আমার কি যাবার জায়গা নেই?

– সুজাতা তুমি অমন করো না। চলো, চলো যাই।

সমর, সমর ডাকতেই থাকলো। সমর লাইব্রেরি থেকে এসে বললো, কি হয়েছে রে, মনে হচ্ছে বিশাল একটা যুদ্ধ বেঁধে গেছে। বাড়িটা দুজনে মাথায় করে রেখেছিস।

– আগে শোন, তারপর মন্তব্য করবি।

– বল, শান্ত হয়ে বল।

– শোন, বিদেশ থেকে কয়েকজন ভিআইপি আসবে তাদের আপ্যায়ন করার জন্য সুদীপ্তাই উপযুক্ত, সুদীপ্তা সর্বগুণে গুণান্বিতা। তাই ওকে নিতে এসেছি। উনার প্রশংসা শুনে অহংকারে টইটম্বুর হয়ে আমাকে না করে দিল। তুই বল, তোরাই তো আমার সম্মান রক্ষা করবি। বিদেশে আমার নাম যশ ছড়িয়ে পড়ুক এটাইতো তোরা চাস।

তা নয় উনি নিজেদের জেদ ধরে বসে আছে, দেখ তুই বলে যদি কিছু করতে পারিস।

– ঠিক আছে, সুজাতা অবাধ্য নয়।

– তাহলে আমি চললাম তোরা টাঙ্গাইল আয়, ওখান থেকে ঢাকা যাবো। বিকেলের দিকে সমর সুজাতাকে বুঝিয়ে ঢাকা পাঠিয়ে দিল অমরের সঙ্গে, রাস্তায় যেতে যেতে সুজাতা একটা কথাও বলেনি। ঢাকায় এনে সুজাতাকে অমর যা যা করতে বলেছে, নির্বিবাদে সে তাই করেছে। সমর সুজাতার ব্যবহারে খুবই খুশি। অমর সুজাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, 'সুজাতা তুমি যে এত ভালো আগে জানতাম না। তুমি এমনভাবে আমার মান সম্মান রক্ষা করবে দেখে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সত্যিই তুমি মহৎ।'

– তোমাকে এত কিছু বলতে হবে না। আমাকে আজই পাঠিয়ে দাও। অমর সব রেডি করে সুজাতাকে সুরুজ যাবার সব বন্দোবস্ত করে দিলো। এতো তাড়াতাড়ি করে আসাতে সমর আশ্চর্য হয়ে গেলো।

– তুমি এসে পড়েছো?

– আসবো না। তোমাকে ছেড়ে আমার একান্ত আপনজনকে ছেড়ে কীভাবে থাকতে পারি? তোমাকে ছেড়ে মারা গেলেও আমি শান্তিতে থাকতে পারবো না।

সমর উত্তেজিত হয়ে দু'বাহু বেষ্টন করে সুজাতাকে ধরে বললো, 'এমন অলক্ষুণে কথা বলো না। তুমি ছাড়া আমার কে আছে। এসো, এসো, ঘরে এসো।' দু'জনে ঘরে এসে বসলো। সমরের বুকে মাথা রেখে সুজাতা বললো, 'আজ তোমার আর আমার যা যা খেতে ভালো লাগে তাই রাঁধবো।' সমর রাজী হলো। সুজাতা বললো, 'জিজ্ঞেস করলে না, কেন?'

– তাইতো কেন কেন?

– কেন আবার কি? এতো ভুলো মন। আজ আমাদের বিবাহ বার্ষিকী।

– ও! সত্যিই আমার ভুলো মন। বাজারের লিস্ট দাও।

– বাচ্চাদের টাঙ্গাইল থেকে আনতে হবে না?

– না, প্রথম ফুলশয্যার রাত যেমন আমরা নিরিবিলি কাটিয়েছি তেমনি এ রাতটাও একান্তভাবে নিজেদের করে কাটাবো, ভালো হবে না?

– হু হু খুব ভালো হবে।

অফিসের দপ্তরী, দারোয়ান ও অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে দুজনের বিবাহ বার্ষিকী পালন করা হলো।

রাত ১টার দিকে সবাই ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লো। আর শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঘুমের কোলে ঢোলে পড়লো। দপ্তরী দারোয়ানরা ঘুম থেকে উঠে ঘরদুয়ার পরিষ্কার করতে লাগলো। সুজাতা সমরের মুখের দিকে পিছন দিয়ে ঘুমিয়েছিলো। সমর ভাবলো অনেক খাটাখাটি গেছে, যাক খানেকক্ষণ ঘুমোক।

সমর সুজাতাকে মাঝে মাঝে আদর করে মহারানী বলে ডাকতো। নিজে হাত মুখ ধুয়ে এসে ডাকলো। মহারানীর ঘুম কি ভাঙলো? ওঠ মহারানী বলে যখন পাশ ফিরাতে নিচ্ছে তখনই সমর চিৎকার দিয়ে উঠলো, এ কি। সত্যেন শিগগির এসো। সুজাতার মুখ দিয়ে ফেনা কেন? তৎক্ষণাৎ সত্যেন ও অন্যান্য দপ্তরী ও দারোয়ান ভিতরে চলে এলো। সমর একবার সুজাতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, আর একবার দৌড়ে বাইরে যাচ্ছে। আর বলতে লাগলো। 'হায় এখন কি হবে, সব আমার দোষ। আমিই বুঝতে পারিনি সুজাতাকে। সুজাতা তোমার কষ্ট, তোমার অসুবিধাটা একবারতো আমাকে বলতে পারতে।'

টাঙ্গাইল থেকে বাড়ির সবাই এসেছে। ঢাকা থেকে অমর এসে অপরাধীর মতো বসে রয়েছে। সবাই শোকাহত। এর মধ্যে কন্যা সুদীপ্তা ঘর থেকে একটা চিরকুট এনে বাবার হাতে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো। চিরকুটটা হাতে নিয়ে সমর খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো-

প্রিয়তমেষু,

সত্যি কথাটা আমি তোমাকে মুখে বলতে পারিনি। তুমি দুঃখ পাবে বলে। তোমাকে এতো ভালোবাসি বলে আজও বলা হলো না। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমাকে ক্ষমা করো।

ইতি-
তোমার অতি প্রিয়
সুজাতা